জীবন জাগার গল্প-১

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

জীবনের ক্যানভাসে আঁকা গল্প

জীবন জাগার গল্প

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ
শিক্ষক
তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস
মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম
শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

শুরুর কথা

এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পই আমাদের নিজস্ব নয়। 'অন্তর্জালে'র বিভিন্ন সাইট থেকে সংগ্রহ করা। আবার হুবহু অনুবাদ বা অনুকরণও নয়। আমরা শুধু ভাবটা সংগ্রহ করেছি। এরপর, গল্পগুলোকে আমাদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া, অনেক গল্পের কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। দেশের পটভূমিতে চরিত্র তৈরি করতে হয়েছে। গল্পগুলো আগে 'মুখপঞ্জিতে' গল্পসল্প-স্বল্পগল্প শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলো পড়ে কারো ভালো লাগলে, অনুপ্রেরণা জাগলে আমাদের ভালো লাগবে। বইয়ের কোন অংশ পছন্দ না হলে এড়িয়ে যাওয়ার অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সার্বিক কল্যাণ দান করুন। আমীন

এই গল্পগুলো লেখার পেছনে ছোট্ট একটা গল্প আছে:

সেবার গেলাম আমার উস্তায মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী সাহেবের দরবারে। তাঁর হাতে ছিলো মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নক্শবন্দী (দা. বা.)-এর একটা হিকায়াতের কিতাব। উনি সেটা মুতালা'আ করছিলেন। হঠাৎ বললেন-

-তুমিও বাংলায় এমন গল্প লেখো না!

-জ্বি, ইনশাআল্লাহ।

গুরুবাক্য শিরোধার্য মেনেই, মনে মনে বিষয়টা নাড়াচাড়া করছিলাম। এরপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেছে, এ-বিষয়ে ভাবার সুযোগ পাইনি। ওটা ছিল বীজ। দীর্ঘ তিন বছর পর বীজ থেকে চারা বের হয়েছে।

তিনি গল্পগুলো পড়েছেন। অনেক অসঙ্গতি ধরিয়ে দিয়েছেন। অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন

গল্পগুলোর পেছনে একটা প্রেরণাও আছে:

একদিন কী মনে করে কয়েকটা গল্প সংগ্রহ করে, নিজের মতো করে সাজিয়ে- অন্তর্জালে দিলাম। ক'দিন পর ফোন করে একজন বললেন, তার কাছে গল্পগুলো ভালো লেগেছে। শুধু ভালোলাগা নয় গল্পগুলোর বিষয়বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণ আর সমালোচনাও করলেন। উৎসাহ আরো বেড়ে গেলো। প্রেরণা পেলাম। তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রয়াস।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আযহারী (দামাত বারাকা-তুহুম)। তার উদার ও সহৃদয় উৎসাহ জীবনের অনেক বাঁক পার হতে সাহস যোগায়। তাঁর উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি। আমীন।

সূচী পত্র

জীবন জাগার গল্প: ০১

মহীয়সী মা

সুদানের এক মসজিদ। ইমাম সাহেব বসে আছেন। ছোট ছোট ছেলেদেরকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। আরেক পাশে হাফেযরা কুরআনের বাড়তি পাঠ গ্রহণ করছে। এমন সময় একটা ছোট ছেলে এলো। সে কুরআন শিক্ষার হালকায় ভর্তি হতে চায়। ইমাম সাহেব প্রশ্ন করলেন:

–তুমি কুরআন কারীমের কোনো অংশ মুখস্থ করেছো?

–জ্বি।

–তাহলে ত্রিশ পারা থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত ক'রে শোনাও। সে সুন্দর ক'রে মুখস্থ তিলাওয়াত করলো। বড়ই মিঠা তিলাওয়াত।

–তুমি সূরা মুলক মুখস্থ করেছো?

–জ্বি।

এবারও তার কণ্ঠে 'মুরাত্তাল' হলো সুললিত তিলাওয়াত। এত ছোট্ট বয়েসে তার হিফজের পরিমাণ দেখে তিনি অবাক হলেন। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

–'তুমি সূরা নাহল মুখস্থ করেছো'?

–'জ্বি'।

সে কিছুটা তিলাওয়াত করেও শোনালো। ইমাম সাহেবের বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো। তিনি তাকে আরো লম্বা সূরা জিজ্ঞাসা করলেন:

–তুমি সূরা বাকারা মুখস্থ করেছো?

–জ্বি।

–তুমি কি পুরো কুরআন কারীমই হিফয করেছো?

–জ্বি।

–আরে, আগে বলবে তো!

ইমাম সাহেব যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললেন:

–তুমি আগামী কাল এসো। সাথে তোমার অভিভাবককেও নিয়ে আসবে।"

ইমাম সাহেব মনে মনে ভাবছিলেন:

–ছেলে এমন হলে, কেমন হতে পারে তার পিতা?

তাঁর জন্য বড়সড় চমক অপেক্ষা করছিলো। পরদিন ছেলেটা তার পিতাকে নিয়ে এলো। পিতাকে দেখে ইমাম সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন। পিতার পুরো অবয়বে দ্বীনের কোনও আলামতই নেই। দাঁড়ি নেই, পোশাক-পরিচ্ছদও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ছেলের পিতা ইমাম সাহেবের বিমূঢ় অবস্থা দেখে বললেন:

–আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে ওর বাবা হিসেবে মেলাতে পারছেন না। প্রকৃত ঘটনা খুলে বললেই আপনার মনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। এই ছেলের পেছনে আছে, আমার মতো হাজার নাফরমান পুরুষের চেয়েও উত্তম এক মহীয়সী নারী। আমাদের ঘরে আরো তিন ছেলে আছে। প্রত্যেকেই হাফেযে কুরআন। আমার চার বছর বয়সী ছোট মেয়েটা পর্যন্ত ত্রিশতম পারাটা মুখস্থ করে ফেলেছে।

ইমাম সাহেব চরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন:

–এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

ছেলেটার বাবা উত্তর দিলো:

– বাচ্চারা যখনই কথা বলা শিখতে শুরু করে, তখন থেকেই তাদের মা কুরআন কারীম হিফয করাতে শুরু করে দেয়। সব সময় হিফযুল কুরআনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ভাই-বোনদের মধ্যে যে প্রথমে সবক শোনাতে পারে তাকেই সবার আগে রাতের খাবার খেতে দেয়। যে আগে আমুখতা (পেছনের পড়া) শোনাতে পারে, সেই নির্বাচন করে এই সপ্তাহে আমরা কোথায় বেড়াতে যাবো। আর যে প্রথমে পুরো কুরআন খতম করতে পারে, সেই ঠিক করে এবার বার্ষিক ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাবো। এভাবে তাদের মাঝে সামনের সবক আর পেছনের পড়া মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

জীবন জাগার গল্প: ০২

চেষ্টার সীমা

ক্যামব্রিজের এক কলেজ। দর্শন ক্লাসে অধ্যাপক প্রবেশ করলেন। হাতে বেশ বড়সড় এক জার (কলস)। সাথে বড় একটা থলে। ডায়াসে (মঞ্চে) উঠে প্রথমে জারটা হাতে নিয়ে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন:

– জারটা কি খালি না ভর্তি?

ছাত্রদের উত্তর:

– খালি।

অধ্যাপক থলে থেকে একব্যাগ পাথুরে কংকর বের করে জারে ঢেলে দিলেন। জারটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেলো।

– বাছারা! এবার বলো তো, জারটা কেমন দেখছ?

– জারটা ভর্তি হয়ে গেছে।

– আর জায়গা আছে?

– না, নেই।

এরপর অধ্যাপক থলে থেকে একব্যাগ ছোট নুড়ি বের করে জারে ঢেলে দিলেন। জারটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিলেন। নুড়িগুলো বড় কংকরের ফাঁক-ফোকরে ঢুকে গেলো।

– খোকারা! বলো দেখি জারটা এখন কেমন?

– জারটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে।

– আর কোনও খালি জায়গা আছে?

– জ্বি না স্যার।

এবার অধ্যাপক তার ঝোলা থেকে বালুভর্তি থলে বের করলেন। বালুগুলো জারে ঢেলে দিলেন। ভালো করে জারটা ঝাঁকিয়ে নিলেন। বালুগুলো কংকর আর নুড়ির মাঝে জায়গা করে নিলো। এবার জিজ্ঞাসা করলেন:

– এখন জারটাকে কেমন দেখছো?

– এবার পুরোপুরি ভর্তি, তিল ধারণেরও জায়গা নেই।

অধ্যাপক ঝোলা থেকে এক বোতল পানি বের করে জারে ঢেলে দিলেন।

পানিগুলো ভেতরে জায়গা করে নিলো। দার্শনিক অধ্যাপক জারটাকে টেবিলের একপাশে রেখে বললেন:

–বাবারা! চলো এই জারের ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি

বিশ্লেষণ এক:

– জারটা তোমার জীবনের মতো। কংকরগুলো হলো তোমারজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন: তোমার পরিবার, তোমার শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি। অন্য সবকিছু হারিয়ে গেলেও শুধু এই বিষয়গুলো থাকলে তোমার জীবনটাকে তোমার কাছে পূর্ণ মনে হবে।

নুড়িগুলো হলো তোমার চাকুরি, তোমার ঘর, তোমার সাইকেল ইত্যাদি।

বালু-পানিগুলো হলো, তোমার জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো। চাবির রিং, জুতোর বাক্স ইত্যাদি।

বিশ্লেষণ দুই:

–তুমি যদি প্রথমে জারটাকে পানি বা বালু দিয়ে ভর্তি করতে তাহলে নুড়ি ও কংকরের কোনও জায়গাই থাকতো না। তোমার জীবনেও যদি তোমার পুরো সময়টাই ছোটখাট বিষয়ের পেছনে ব্যয় করো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য কোনও সময়ই থাকবে না। তাই প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দাও; নুড়ি, বালু আর পানির জন্য জায়গা এমনিতেই হয়ে যাবে।

বিশ্লেষণ তিন:

–দেখো, কংকর দিয়ে জারটা ভর্তি করার পর তোমার মনে হয়েছিল আর জায়গা নেই, কিন্তু তারপরও নুড়ি, বালু আর পানি রাখার জায়গা বের হয়েছে। তুমি যতই চেষ্টা করো, তারপরও বাড়তি চেষ্টার অবকাশ থেকে যায়।

জীবন জাগার গল্প: ০৬

সমস্যার ওজন

পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস। শিক্ষক এক গ্লাস পানি হাতে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন।

–বলতো বাছারা! এই এক গ্লাস পানির ওজন কতটুকু হবে?

–এই আর কত হবে, একশ বা দেড়শ গ্রাম, স্যার?

–আসলেই তাই। এই এক গ্লাস পানির কোনও ওজনই অনুভব করছি না। আচ্ছা, যদি দশ মিনিট ধরে রাখি তাহলে এর ওজন কতটুকু হবে?

–আগের মতোই থাকবে।

–আচ্ছা, যদি এভাবে একঘণ্টা ধরে রাখি, তাহলে কী ঘটবে?

–আপনার হাত ব্যথা করবে, স্যার!

–ঠিক বলেছো। আচ্ছা, যদি এভাবে একদিন ধরে রাখি?

–তাহলে স্যার! আপনার হাত অবশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনকি হাসপাতালেও যেতে হতে পারে।

–একদম ঠিক বলেছো। তোমাদের কী মনে হয়, গ্লাসের ওজন বেড়ে গিয়েছিলো?

–জ্বি না স্যার।

–তাহলে এই ব্যথা, হাত অবশ হওয়া এগুলো কোত্থেকে দেখা দিলো?

ছাত্রদের কাছে এর উত্তর ছিল না। শিক্ষক আবার প্রশ্ন করলেন:

–এই ব্যথা থেকে বাঁচার জন্য আমাকে কী করতে হবে?

–গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেই ব্যথা আর থাকবে না।

–দারুণ বলেছো।

–দেখো! জীবনের সমস্যাগুলোও এমনই। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মাথায় রাখলে কিছু হবে না। কিন্তু সারাক্ষণ এই সমস্যাকে মাথায় ঢুকিয়ে রাখলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কাজেই, তোমরা হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখতে শেখো।

জীবন জাগার গল্প: ০৪

এক গ্লাস দুধ

একটি দরিদ্র বালক। রাস্তায় ফেরি করে টুকিটাকি গৃহস্থালি জিনিষপাতি বিক্রি করছে। দরজায় দরজায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কারো এসব লাগবে কিনা, ছেলেটা এই বিক্রির টাকা দিয়ে তার নৈশ স্কুলে পড়ালেখার খরচ জোটায়।

এক তীব্র গরমের দিন, গনগনে সূর্যের গরমে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটার ভীষণ পিপাসা পেলো। পকেট হাতড়ে দেখলো, শুধু একটা কয়েন আছে। এটা দিয়ে তো কিছুই কেনা যাবে না।

ছেলেটা ভাবলো, সামনের বাড়িটাতে গিয়ে কিছু খাবার ধার চাইবো। পরে দাম পরিশোধ করে দেবো। দরজায় টোকা দিলো। একটি ছোট মেয়ে দরজা খুলে বললো:

– কী চাই?

ছেলেটা খাবার না চেয়ে প্রথমে এক গ্লাস পানি চাইলো।

মেয়েটি দেখলো, ছেলেটা ভীষণ ক্লান্ত। দরদর ঘামছে। ভেবেচিন্তে বড় এক গ্লাসে করে দুধ এনে দিলো। ছেলেটা ধীরে ধীরে দুধটুকু পান করলো। গ্লাসটা ফিরিয়ে দেয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলো:

– এক গ্লাস দুধের দাম কতো?

–তোমাকে দুধের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। আম্মু বলেছেন, কাউকে সহযোগিতা করে বিনিময় চাইতে নেই।

ছেলেটা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিদায় নিলো। ছেলেটা এবার শরীরে বল পেলো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো। মানুষের মহানুভবতায় মুগ্ধ হলো।

এ ঘটনার অনেক বছর পর। সেই মেয়েটি একবার, খুবই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো। স্থানীয় ডাক্তার তার সঠিক চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হলেন। এক বড় শহরে তাকে স্থানান্তর করা হলো। এই দুরারোগ্য ব্যাধির অপারেশানের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হলো। ঘটনাক্রমে সেদিনের সে ছেলেটাই ছিল আজকের এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। ডাক্তার রোগীর ফাইল পড়তে গিয়ে শহরের নাম দেখে কৌতূহলী হলেন। তাড়াতাড়ি কেবিনে রোগীটাকে দেখতে গেলেন। সেদিনের মেয়েটাকে দেখেই চিনতে পারলেন। ডাক্তার নিজের সবটুকু মেধা যোগ্যতা নিঃশেষে ব্যয় করলেন মেয়েটার চিকিৎসার পেছনে। বিশেষ নজর রাখলেন তার প্রতি। অনেক দীর্ঘ জটিল অপারেশানের পর, মেয়েটার অবস্থার উন্নতি হলো। ডাক্তার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে রাখলেন, এই রোগীর বিলের কাগজটা যেন চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য তার কাছেই পাঠানো হয়। রিলিজের দিন সিস্টার বিলের কাগজ তার কাছে নিয়ে এলো। ডাক্তার বিলের এককোণে কিছু একটা লিখে বিলটা পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েটা বিলের পরিমাণ দেখে আঁতকে উঠলো। এত টাকা সে পাবে কোথায়। এই বিল পরিশোধ করতে সম্পত্তি বলতে যা আছে তার সবই বিক্রি করতে হবে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো বিলের নিচে এককোণে লেখা আছে:

এক গ্লাস দুধের বিনিময়ে এই বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত।

জীবন জাগার গল্প: ০৬

অগোচরে সৎকর্ম

ছোট্ট কুটির। এক বৃদ্ধ লোকের আবাস। বৃদ্ধ লোকটি কলসি ভরে মানুষের বাড়ি বাড়ি পানি পৌঁছে দেয়। বিনিময়ে যা পায় তা দিয়ে কোনও রকমে খাওয়া-পরা চলে যায়।

লোকটির কাছে দুটি কলসি ছিলো। একটি ভালো, আরেকটি ভাঙা। কলসি দু'টোকে একটা বাঁশের বাঁকের (বাঁশের মোটা ফালি) দুপাশে বেঁধে সে পানি আনা-নেয়া করতো।

নদী থেকে পানি তুলে গ্রামের শেষ মাথা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানি দিয়ে আসতো। এতদূর পানি নিতে নিতে দেখা যেতো ভালো কলসিটা থেকে কোনও পানি ছলকে পড়তো না, কিন্তু ভাঙা কলসি থেকে রাস্তায় রাস্তায় পানি ছলকে পড়ে যেতো। পথশেষে দেখা যেতো, ছলকে পড়তে পড়তে ভাঙা কলসির পানি অর্ধেক হয়ে গেছে।

এজন্য ভাঙ্গা কলসিটার মন খারাপ। তার করণীয় কাজ সে ঠিকমতো করতে পারছে না। একদিন বৃদ্ধ মনিবকে তার মনের কষ্ট আর লজ্জার কথা সে খুলে বললো:

–আমি তো আমার বোনের মতো পরিপূর্ণভাবে আপনার সহযোগিতা করতে পারছি না।

বৃদ্ধ ভাঙা কলসিটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন:

–তুমি কি একটা বিষয় লক্ষ করেছো?

–কোন বিষয়টা মনিব?

–আমি প্রতিটি বাড়িতে শুধু পানিই পৌঁছে দিই না, প্রতিবারই পানির সাথে কিছু ফুলও দিয়ে আসি?

–হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি পানি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ফুটে থাকা গাছ থেকে কিছু ফুলও তুলে নিয়ে যান।

–তুমি কি লক্ষ করো নি প্রতিবারই কাঁধে নেয়ার সময় তোমাকে একদিকেই রাখি। আর তোমাকে যেদিকে রাখি সেদিকেই ফুলগুলো ফোটে। তোমার ভেতর থেকে পানি ছলকে না পড়লে এই ফুলগুলো তো ফুটতো না।

জীবন জাগার গল্প: ০৬

দুয়ে দুয়ে তিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটি দ্বীপ। জ্যামাইকা। র‍্যাগ সংগীতের জনক বব মার্লের দেশ। কিংবদন্তি ক্রিকেটার কোর্টনি ওয়ালশের জন্মভূমি। এই দ্বীপে একজন বিদগ্ধ আলিম দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে গেলেন। বার্ষিক এক অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সমাগম। সেই জনসমাগমে তিনি সামান্য কথা বলার সুযোগ চাইলেন। শ্রোতারা বললো:

–আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনার কথা শুনবো।

তারা প্রশ্ন করলো:

–দুইজন ব্যক্তির কাছে দুইটা করে চারটা বস্তু আছে। সে দুই ব্যক্তি ঠিক করলো, তারা তাদের কাছে থাকা বস্তুদুটো বিনিময় করবে। বিনিময় হলো। প্রথমবার বিনিময় করার পর দেখা গেলো, তাদের উভয়ের কাছেই আগের মতোই দুটো করে বস্তু আছে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বস্তুটা বিনিময় অর্থাৎ একজনেরটা আরেকজনকে দিলো, তখন উভয়ের কাছে তিনটা করে বস্তু হয়ে গেলো। অথচ হওয়ার কথা দুটো করে। এটা কিভাবে সম্ভব?

আলিম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন:

–ধরা যাক আমার কাছে একটি আপেল আছে এবং একটি 'উপদেশ' আছে, তদ্রূপ উপস্থাপকের কাছেও একটি আপেল আছে এবং আরেকটি 'উপদেশ' আছে। এখন আমরা যদি একজনের আপেল আরেকজনকে দিয়ে দিই, তাহলে আমাদের উভয়ের কাছেই একটি করে আপেল থাকবে।

পক্ষান্তরে আমাদের উভয়ের উপদেশ বিনিময় করার পর, আমাদের উভয়ের কাছেই দুটি করে উপদেশ থাকবে। একটা নিজের, আরেকটা অপরজনের। তাহলে দুইটা বস্তু বিনিময় করার পর দুটো না হয়ে তিনটা হয়ে গেলো।

আল্লাহর পথের আলিম তাঁর কথা শেষ না করে বলে চললেন:

–এইমাত্র আমি যে উপদেশটা উপস্থাপকের সাথে বিনিময় করলাম, আপনারা কি সেটা শুনতে চান?

–জ্বি, চাই।

এবার আলিম দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করলেন।

জীবন জাগার গল্প: ০৭

মাছ-রান্না

এক মহিলার মাছ-রান্নার বেশ সুখ্যাতি। মাছ রান্না করলে তার সুঘ্রাণে চারদিক মৌ-মৌ করতে থাকে। মাছ-তরকারির মৌতাতে প্রতিবেশীদের জিবেও পানি এসে যায়। এক বান্ধবী এলো মাছ-রান্নার গোপন রহস্য জানতে। বান্ধবীটি তীব্র কৌতূহলের সাথে মাছরান্না দেখতে লাগলো। লক্ষ করে দেখলো, রাঁধুনি তেলে ভাজার আগে, মাছটার মাথা ও লেজ কেটে ফেললো। বান্ধবী এর রহস্য জানতে চাইলো। রাঁধুনি বললো:

–আমি তো জানি না। আম্মুকে দেখেছি এভাবে করতে।

রাঁধুনি তার মায়ের সাথে ফোনে যোগাযোগ করলো।মা বললেন: কারণ তো আমিও জানি না। আমিও আমার আম্মুকে এভাবেই করতে দেখেছি। একটু অপেক্ষা করো, আমি তোমার নানুকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

–হ্যালো আম্মু! আপনি মাছ ভাজার সময় মাথা আর লেজ কেটে ফেলতেন কেনো? আপনার নাতনি জানতে চেয়েছে।

–কেনো তুমি দেখো নি, আমাদের কড়াইটা ছোট ছিলো। বড় মাছ সেটাতে ধরতো না। তাই মাছের দুদিকেই কিছু কেটে ফেলতে হতো।

জীবন জাগার গল্প: ০৮

চিন্তার শৃঙ্খলা

জ্যাকসন হাইট। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। এক পার্টি সেন্টারে প্রবাসী বাঙালিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষদিন। আজকে পরীক্ষক হিসেবে আছেন ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তাওফীকে এলাহি। ড. তাওফীকে এলাহি হলঘরে প্রবেশ করেই বললেন, আমরা একটা খেলা দিয়েই শেষদিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবো। এই যে আমার হাতে অনেকগুলো বেলুন আছে। এটাই আমাদের খেলার উপকরণ।

সবাইকে একটা করে বেলুন দিয়ে বললেন, সবাই নিজ নিজ বেলুনটা ফুলিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধুন। বেলুনের উপর নিজের নাম লিখুন। এবার পাশের কামরায় বেলুনগুলো রেখে আসুন।

ডক্টর বললেন, আমাদের খেলা হলো, পাশের কামরা থেকে যে যার নাম লেখা বেলুনটা নিয়ে আসবেন। সময় দশ সেকেন্ড।

সবাই পড়িমরি করে ছুটলো। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে বেলুনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। গুটিকয়েকজন নির্ধারিত সময়ে বেলুন নিয়ে ফিরলো।

ডক্টর এবার সবাইকে নিয়ে পাশের কামরায় আবার গেলেন। বললেন, প্রত্যেকেই একটা করে বেলুন নিন। এবার নাম দেখে যার বেলুন তাকে দিয়ে দিন।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী! আপনারা যদি প্রথমবারেই এভাবে কাজ করতেন, অন্যকে ডিঙিয়ে নিজেরটা আদায় করতে না চাইতেন, তাহলে সবাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন।

জীবন জাগার গল্প: ০৯

তোলা কফি

ইতালির নেপোলি। ম্যারাডোনার শহর। একটি রেস্তোরাঁয় দুই আরব পর্যটক যুবক বসে আছে। তাদের একজনের মুখেই গল্পটা শোনা যাক:

আমরা দুই বন্ধু ক্যাফেতে প্রবেশ করলাম। বেছে বেছে কোনায় নিরিবিলি দেখে এক টেবিলে বসলাম। দুই মগ কফির ফরমায়েশ করলাম। বসে বসে কফিতে হালকা চুমুক দিচ্ছিলাম।

এমন সময় দু'জন ছাত্র আসলো। একজন জোর গলায় কফির ফরমায়েশ দিয়ে বললো: চার মগ কফি দাও, দুই মগ তোলা রাখো।

আমি অবাক হয়ে বললাম:

দুই মগ 'তোলা রাখা' মানে কী?

আমার সাথী বললো:

ধৈর্য ধরো, কী ঘটে দেখা যাক।

এরপর আরো চারজন ছাত্র ক্যাফেতে ঢুকে জোরে হাঁক দিয়ে বললো, ছয় মগ কফি, দুই মগ তোলা রেখে দাও।

এরপর আমরা বসে বসে টুকটাক কথা বলছি। জানালার পাশে বসে বরফ পড়া দেখছি। এমন সময় জীর্ণশীর্ণ পোশাকের এক বৃদ্ধা ধুঁকে ধুঁকে ক্যাফেতে আসলো। ঠাণ্ডায় কাশতে কাশতে ম্যানেজারকে বললো:

সিনর! কোনও তোলা কফি আছে?

সিনরিটা! একটা দুটো নয় প্রায় চার মগ তোলা কফি আছে।

আমার এক মগ কফি হলেই চলবে, সিনর!

এরপর বৃদ্ধাটি এক মগ কফি খেয়ে চলে গেলো। কোনও দাম না চুকিয়েই।

দুই আরব বন্ধু বললো! দারুণ এক প্রথা তো, তাই নয় কি?

অবশ্যই, চলো আমরাও আমাদের দেশে গিয়ে এমন একটা সুন্দর প্রথা চালু করি।

হাঁ, হাঁ, ঠিক আছে।

জীবন জাগার গল্প: ১০

আত্মবিশ্বাস

জিদ্দা বিমানবন্দরের পাশের এক পার্ক। গোধূলির অন্তিম সময়। চারপাশ আস্তে আস্তে আঁধারে ছেয়ে যাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চিতে এক বিষণ্ন যুবক বসে আছে। দু'হাতে মাথাটা গুঁজে রেখেছে। চিন্তায় পুরো শরীর নুয়ে পড়েছে।

এমন সময় লাঠি ঠকঠক করে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে আসলো। যুবকের অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তার দূরবস্থার কথা জানতে চাইলো। যুবক! তোমার কী হয়েছে?

যুবকটি বললোঃ

আমি আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করি। কিন্তু গত মাস ছয়েক আগে, কাস্টমসের জটিলতায় আমার একটা চালান আটকে যায়। আমার প্রায় পুরো পুঁজিই ওই চালানে ছিলো। এই চালান ছাড়িয়ে আনার কোনো উপায়ই দেখছি না। পথে নেমে আসা ছাড়া আর কিছু করার নেই। চারদিক থেকে পাওনাদাররা ছেঁকে ধরছে। নামমাত্র পুঁজি হাতে আছে।

বৃদ্ধ লোকটি সব শুনে, বিনা বাক্যব্যায়ে পকেট থেকে একটা চেকবই বের করে মোটা অংকের একটা চেক কেটে, খসখস করে স্বাক্ষর করে যুবকের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, নাও এটা তোমাকে দিলাম। এক বছর পর ঠিক এই সময়ে, এই স্থানে আমাকে টাকাটা ফেরত দিতে হবে।

বৃদ্ধ লোকটি চেকটা দিয়ে হনহন করে আঁধারে মিলিয়ে গেলেন।

যুবকটি ঘটনার আকস্মিকতায় বুঝে উঠতে পারছিলো না কী করবে। ঝিম ধরে কিছুক্ষণ বসে রইলো। তারপর তড়াক করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কোথাও বৃদ্ধ লোকটিকে দেখা যাচ্ছে না। চেনা নেই, জানা নেই, হুট করে এত টাকাও এভাবে কেউ কাউকে দেয়?

ঘরে ফিরে এসে চেকটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো, নীচে স্বাক্ষরের স্থানে লেখা: আদনান খাশোগি। আরে ইনি তো দেশের অন্যতম শিল্পপতি। যুবকটি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, চেকটা নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে ভাঙাবে না। শেষ চেষ্টা করে দেখবে। একদম ঠেকায় পড়লে (ব্যাকআপ হিসেবে) চেকটা তো রইলোই।

নতুন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে, নব উদ্যমে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিলো। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। বছর পার হওয়ার আগেই ব্যবসায় আগের মতো সুদিন ফিরে আসলো। চেকটাতে হাত দিতে হয় নি।

এক বছর পর, নির্দিষ্ট তারিখে চেকটা নিয়ে সেই পার্কে গিয়ে হাজির হলো। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বৃদ্ধটি আসলো।

যুবকটি বললো: এই নিন আপনার চেক। আপনার এই বদান্যতার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমি ওটা ভাঙাই নি। প্রয়োজন পড়ে নি। বৃদ্ধ অবাক হয়ে চেকটা হাতে নিলো।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একজন নার্স দুজন গার্ডসহ দৌড়ে এলো। বৃদ্ধকে বললো: আপনি আজও পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন? চলুন ফিরে চলুন। নার্সটি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো: উনি আবার আপনাকে কোনও চেক দেন নি তো! উনি আদনান খাশোগির নামে স্বাক্ষর করে সবাইকে চেক দিয়ে বেড়ান।

যুবকটি হতভম্ব হয়ে গেলো। তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, চেকটা ভুয়া ছিলো। যেমনই হোক, ওটাই তো আমাকে প্রবল প্রেরণা যুগিয়েছে।

জীবন জাগার গল্প: ১১

প্রকৃত ভালোবাসা

স্বামী আর স্ত্রী বেড়াতে গেলো। চিড়িয়াখানায়। তারা দেখলো একটি বানর তার সঙ্গিনীর সাথে খেলছে, খুনসুটি করছে। স্ত্রী দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীকে বললো,

কী চমৎকার ভালোবাসার দৃশ্য!

এরপর তারা গেল সিংহের খাঁচার কাছে। দেখলো, সিংহ খাঁচার একপাশে চুপচাপ বসে আছে। সিংহীটাও অদূরে অন্য দিকে ফিরে বসে আছে। স্ত্রী দেখে বললো:

আহ! ভালোবাসার কী নির্মম পরিণতি!

স্বামী এতক্ষণ চুপচাপ স্ত্রীর পাশে হাঁটছিলো। এবার নীরবতা ভঙ্গ করে বললো: ধরো! এই কাচের টুকরোটা সিংহীর দিকে ছুঁড়ে মারো, দেখো কী ঘটে!

মহিলাটি যখন কাচের টুকরোটা ছুঁড়ে মারলো, সিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। সঙ্গীনীকে বাঁচানোর জন্য গর্জে উঠলো।

এবার মেয়ে বানরটার দিকে ছুঁড়ে মারো। দেখ কী ঘটে। পুরুষ বানরটার আচরণ লক্ষ করো।

স্ত্রী কাচের টুকরোটা বানরীর দিকে ছুঁড়ে মারলো। দেখা গেলো ছুঁড়ে মারার আগেই বানরটা আত্মরক্ষার্থে ছুটে পালিয়ে গেলো। সঙ্গিনীর দিকে ফিরেও তাকালো না।

স্বামী বললো, মানুষ তোমার সামনে যা প্রকাশ করে তা দেখে প্রভাবিত হয়ে যেয়ো না। অনেক মানুষ আছে যারা তাদের বানোয়াট লোক দেখানো আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে অন্যকে প্রতারিত করে। আবার অনেক মানুষ আছে যারা ভেতরে গভীর অনুরাগ-ভালোবাসা লুকিয়ে রাখে।

জীবন জাগার গল্প: ৯২

দেশ-শাসন

মরহুম সাদ্দাম হুসাইনকে একবার প্রশ্ন করা হলো, এই যে আজ ইরাকে কোথাও একফোঁটা শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, শৃঙ্খলা নেই, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নেই। আপনার শাসনামলে তো এমন ছিলো না।

আপনাকে যদি জেলখানা থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে কতক্ষণ সময় নেবেন?

তিনি উত্তর দিলেন, বেশি নয়, বড়জোর ঘণ্টা তিনেক সময় হলেই চলবে।

কিভাবে?

সাদ্দাম বললেন,

প্রথম ঘণ্টায় টুকিটাকি কাজ সারবো, সামান্য ক্ষৌরকর্ম করবো।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় নামায-তিলাওয়াত করবো, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করবো।

তৃতীয় ঘণ্টায় জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দেবো।

এরপরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প: ১৩

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ চলছে। আজকের বিষয় 'আমরা সবসময় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবো'। প্রশিক্ষক সবাইকে বৃত্তাকারে দাঁড় করালেন। সবাইকে একটি করে বেলুন দিলেন। সাথে একটি সুতো। সবাইকে বেলুন ফুলিয়ে সুতো দিয়ে বাঁধতে বললেন।

এবার একটা খেলা। খেলার সময় এক সেকেন্ড। আমার কাছে অনেকগুলো পুরস্কার আছে। পাঁচ সেকেন্ড পর, যার কাছে অক্ষত বেলুন থাকবে সে-ই পুরস্কার লাভ করবে।

সময় শুরু হলো।

হৈ হৈ করে সবাই একে অপরের বেলুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঠাস ঠিস ঠুস। সব বেলুন ফুস। শুধু একজনের হাতের বেলুন অক্ষত রইলো।

শিক্ষক বৃত্তের মধ্যবিন্দুতে এসে দাঁড়ালেন, গভীর বিস্ময়ে বললেন,

আমি কিন্তু কাউকে অন্যের বেলুন ফোটাতে বলি নি। সবাই যদি অন্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত না নিয়ে নিজ নিজ বেলুন নিয়ে, আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতো, সবাই পুরস্কার লাভ করতো। কিন্তু নেতিবাচক মানসিকতা সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

প্রশিক্ষক আরো বললেন, আমাদের প্রত্যেকেই অন্যকে ঠেলে, পেছনে ফেলে সফল হতে চাই। অথচ সবার একসাথেই সফল হওয়ার সুযোগ থাকে। আফসোসের বিষয় হলো, আমরা সবসময় শুধু নিজের সফলতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য অন্যকে ধ্বংস করতে ধাবিত হই।

জীবন জাগার গল্প: ১৪

ভালোবাসার পার্থক্য

কর্ণফুলি সেতু। আবীর সাহেব ছোট মেয়ে যাহওয়াকে নিয়ে হাঁটছেন। হেঁটে সুন্দর এই ব্রিজের দুপাশের নদীর সৌন্দর্য অবলোকন করছেন। তিনি মেয়েকে বললেন,

মা মণি! শক্ত করে আমার হাত ধরো, ব্রিজ দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে। কখন কী হয় বলা তো যায় না।

মেয়ে বললো,

না আব্বু! বরং আপনিই আমার হাতটা শক্ত করে ধরুন।

বাবা অবাক হয়ে বললেন:

দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?

যাহওয়া বললো:

অনেক পার্থক্য। আমি যদি আপনার হাত ধরি, বিপদের সময় আমি আপনার হাতটা ছেড়েও দিতে পারি।

কিন্তু আপনি আমার হাত ধরলে, যত বড় বিপদই আসুক, আমি জানি আপনি আমার হাত কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

জীবন জাগার গল্প: ১৫

ছেলের বিয়ে

ছেলে বাবাকে বললো, আব্বু আমি বিয়ে করতে চাই। একজনকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

কোথায় চলো দেখি, সব ঠিক থাকলে আমার আপত্তি নেই।

মেয়েটিকে বাবা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ছেলেকে বললেন, দেখ তুমি এই মেয়ের যোগ্য নও। আমার মতো অভিজ্ঞ একজন মানুষই এই মেয়ের স্বামী হওয়া দরকার।

পিতাপুত্রে তখন মস্ত বিবাদ। মীমাংসার জন্য তারা স্থানীয় বিচারকের কাছে গেলো।

বিচারক বললেন, তোমাদের কথা শুনে এবং মেয়েটিকে দেখে আমার যা মনে হলো, তোমাদের দুজনের কেউই এর নখের যোগ্যও নও। আমার মতো একজন পদস্থ ব্যক্তিই এই মেয়ের বর হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

এভাবে বিচার গড়াতে গড়াতে দেশের প্রধান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো। রাজা মেয়ে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন, খামোশ! এই মেয়ে রাজার ঘর ছাড়া আর কোথাও মানাবে না।

এই জটিল পরিস্থিতিতে মেয়েটি মুখ খুললো। আমার কাছে এই সমস্যার সমাধান আছে:

আমি দৌড় দেবো। যে আমাকে আগে ধরতে পারবে তার সাথেই আমার বিয়ে হবে।

মেয়েটি তীরবেগে দৌড় দিলো। তার পিছু পিছু বরবাহিনীও পড়িমরি করে ছুটলো। দৌড়াতে দৌড়াতে কিছুদূর গিয়ে বরবাহিনী হুড়মুড় করে এক অতল গহ্বরে পড়ে গেলো।

মেয়েটি গর্তের মুখে এসে বললো, তোমরা কি জানো, আমি কে? আমি হলাম দুনিয়া। আমার পেছনেই সমস্ত মানুষ দৌড়ায়। আমাকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে সবাই নিজের দ্বীনকে ভুলে যায়। এভাবে এক সময় কবরে চলে যায়, কিন্তু আমার নাগাল পায় না।

জীবন জাগার গল্প: ৯৬

রিয়া বিল কাযা

এক বৃদ্ধ লোকের দুই মেয়ে। বিয়ের উপযুক্ত। বিভিন্ন দিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। বুড়ো-বুড়ির ইচ্ছে দুই মেয়েকে একসাথে বিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়ে গেলো। বড় মেয়ের স্বামী কৃষক। ছোটটার স্বামী কুমোর।

বিয়ের কিছুদিন পর বুড়ো মেয়েদের দেখতে গেলেন। প্রথমে বড় মেয়ের কাছে গেলেন। বাবাকে পেয়ে মেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলো।

আমার বড় মা মণি! কেমন আছো? সংসারের কী অবস্থা?

ভালো আছি। আপনার জামাই একটি জমি ইজারা নিয়েছে। জমির বীজ ঋণ করে কিনে এনেছে। বীজ বোনা হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টির অপেক্ষা। বৃষ্টি হলে আমাদের আর কোনও সমস্যা থাকবে না। বৃষ্টি না হলে আমাদের মুসিবতের কোনও শেষ থাকবে না।

ছোট মেয়ের বাড়ি গেলেন। মেয়ে বাবাকে পেয়ে খুশিতে কেঁদে ফেললো। বাবা বললেন,

ছোট মামণি! কেমন আছো?

ভালো আছি। আপনার জামাই ঋণ করে কিছু মাটি কিনে হাঁড়িপাতিল তৈরি করেছে। সেগুলো আমরা রোদে শুকোতে দিয়েছি। যদি বৃষ্টি না আসে আমাদের আর কোনও দুঃখ থাকবে না। বৃষ্টি আসলে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।

বাড়ি ফিরে এলে বুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কলিজার দুই টুকরা কেমন আছে?

ভালো আছে। যদি বৃষ্টি হয় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। আর বৃষ্টি না হলেও শুকরিয়া আদায় করো।

জীবন জাগার গল্প: ১৭

পাছে লোকে কিছু বলে

একদল লোক বনের মাঝ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে তাদের মধ্যে দুজন লোক ভুলক্রমে এক গভীর গর্তে পড়ে গেলো।

অনেক চেষ্টা করেও দুজনের কাউকে তুলে আনা গেলো না। শেষে তারা চেষ্টায় ইতি টানলো।

পড়ে যাওয়া দুজন লাফিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করলো। গর্তের গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলো। কোনও কাজ হলো না। গর্তটি অত্যন্ত গভীর। ওপর থেকে লোকেরাও চিৎকার করে বললো, চেষ্টা করে লাভ নেই। এ গর্ত সীমাহীন গভীর। তোমরা উঠে আসতে পারবে না। আমাদের পক্ষেও তোমাদেরকে সাহায্য করা অসম্ভব। এ গর্তেই তোমাদেরকে মরতে হবে।

একজন লাফালাফি করতে গিয়ে সত্যিসত্যিই মারা পড়লো। আরেক জন চেষ্টা করে যেতে লাগলো। উপর থেকে অন্যরা বলতে লাগলো, চেষ্টা করে তো লাভ নেই। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। কিন্তু লোকটি চেষ্টা করেই যেতে লাগলো।

একসময় লোকটি বের হয়ে এলো। লোকেরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো কিভাবে বের হয়ে এলে? অনেক প্রশ্ন করেও তারা কোন উত্তর পেলো না।

তারা অবাক হয়ে লক্ষ করে দেখলো, লোকটি বধির ও বোবা। কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। শুধু দেখতে পায়। লোকটি ভেবেছিলো ওপর থেকে অন্যেরা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

জীবন জাগার গল্প: ১৮

আস্থা

একটি বিমান উড়ে চলছে। মেঘের বুক চিরে। হাওয়ায় ডানা মেলে। আচানক এয়ার পকেটের ঝাক্কিতে পড়ে বিমানটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো। পুরো বিমানে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। বিমানটা বারবার ঝাঁকি খেতে লাগলো। ভীত-সন্ত্রস্ত যাত্রীরা এটা-ওটা ধরে তাল সামলাতে লাগলো। কিন্তু একটি শিশু আশেপাশের পরিস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে আপনমনে খেলে যেতে লাগলো। শান্তশিষ্টভাবে। সীটবেল্ট বাঁধা থাকায় খুব বেশি সমস্যাও হচ্ছিলো না।

শিশুটির পাশের যাত্রী ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক। বিমানটি নিরাপদে জরুরি অবতরণ করার পর, বৃদ্ধ লোকটি শিশুটিকে প্রশ্ন করলেন, এত উত্তেজনা, ভয়-শঙ্কার মধ্যে তুমি কিভাবে নিরুদ্বেগ ভয়-ডরহীন ছিলে?

শিশুটি উত্তর দিলো:

আমার আব্বু এই বিমানটির চালক। তিনি আমাকে আসনে বসিয়ে দেয়ার সময় বলে গেছেন, ইনশাআল্লাহ আমরা নিরাপদে আম্মুর কাছে পৌঁছব। কই, আব্বু এসে তো কোনও অসুবিধের কথা বলেন নি?

জীবন জাগার গল্প: ৯৭

বোকা ছেলে

নাপিত দোকান। নরসুন্দর (নাপিত) একজন খদ্দেরের চুল কাটছে। এমন সময় একটি ছোট শিশু এসে সেলুনের দরজায় উঁকি মারলো। নাপিত ছেলেটাকে দেখেই মুচকি হাসলো। খদ্দেরের কানে কানে বললো:

এই ছেলেটা খুবই বোকা। পাশের বাড়িতে থাকে।

বোকা! কেনো?

বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা তাহলে দেখুন।

নাপিত এগিয়ে এসে ড্রয়ার খুললো। একহাতে নিলো একশ টাকার একটা নোট, আরেক হাতে পাঁচটা এক টাকার নোট। দুই হাতই ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো:

এই নে, তোর যে হাতেরটা ইচ্ছা, নিয়ে যা। গিয়ে কিছু কিনে খা।

ছেলেটা এগিয়ে এসে পাঁচটা এক টাকার নোট নিলো।

নাপিত খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে বললো:

কী আমি বলিনি, এই ছেলেটা আস্ত বুদ্ধু আর হাঁদারাম? ওকে আমি এই পর্যন্ত অনেকবার পরীক্ষা করেছি, প্রতিবারই সে বোকামির পরিচয় দিয়েছে।

খদ্দের লোকটি চুলকাটা শেষ হলে সেলুন থেকে বের হয়ে আসলো। অদূরে একটি জটলার উপর চোখ পড়লো। দেখলো ছেলেটি আইসক্রিম কিনে খাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো:

তুমি এক টাকার নোট আর একশ টাকার নোটের পার্থক্য বোঝ না?

হ্যাঁ, বুঝি।

তাহলে প্রতিবারই কেন একশ টাকার নোটটা না নিয়ে এক টাকার নোটগুলো নাও?

ছেলেটি ঝটিতি উত্তর দিলো:

কারণ যেদিন আমি একশ টাকার নোট নেবো সেদিন থেকেই এই বোকা বোকা খেলা শেষ হয়ে যাবে। আর আমিও আইসক্রিম খেতে পারবো না।

জীবন জাগার গল্প: ২০

বর্ণবৈষম্য

ইমিরেটস বিমান। সানফ্রান্সিসকো থেকে রোমে যাচ্ছে। এক শাদা মহিলার আসন পড়লো এক কালো পুরুষের সাথে। শাদা মহিলা একজন নিগ্রোর পাশে বসাটা মেনে নিতে পারছিলো না। বিমানবালাকে ডেকে বললো,

আমি এই কালো ও কুৎসিত লোকটার পাশে বসতে চাই না। এর একটা ব্যবস্থা নেয়া হোক।

আরব বিমান, তাই বিমানবালাটিও ছিল আরব। সে বিনয়ের সাথে বললো,

ম্যাডাম! বিমানের প্রায় সবগুলো আসনই ভর্তি। তারপরও আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি দেখছি, কিছু করা যায় কি না।

কিছুক্ষণ পর বিমানবালা ফিরে এসে বললো,

ম্যাডাম! সাধারণ ক্লাসে কোথাও কোন আসন খালি নেই। তবে বিজনেস ক্লাসে একটা আসন খালি আছে। কিন্তু বিমানের নিয়ম হলো, সাধারণ ক্লাসের কোন যাত্রীকে বিজনেস ক্লাসে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তবে আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্যাপ্টেন বলেছেন:

আমরা একজন যাত্রীকে কোনও কুৎসিত ব্যক্তির পাশে বসতে বাধ্য করতে পারি না।

একথা বলেই বিমানবালাটি লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকা কালো মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললো,

স্যার! আপনি কি দয়া করে আপনার ব্যাগটা নিয়ে আমার সাথে আসতে পারবেন? আপনার জন্য আমাদের বিমানের পক্ষ থেকে বিজনেস ক্লাসের একটি আসন বরাদ্দ করা হয়েছে।

ঘটনার আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে শাদা মহিলাটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। আর আশপাশের যাত্রীরা যারা এতক্ষণ ঘটনাটার প্রতি নজর রাখছিলো, তারা বিমানবালার সুন্দর মানবিক আচরণের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলো।

জীবন জাগার গল্প: ২৯

আলু-ডিম-চা

মেয়ের বিয়ে হয়েছে। মা মরা মেয়েটা বড়ই আদরের। কখনো মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে মেয়েটা সুখে নেই। সকালে বাপ-বেটি চা খেতে বসলেন। মেয়ে বাবার কাছে তার দুঃখের কথা বলে কেঁদে ফেললো। মেয়ে বললো, ও-বাড়িতে সমস্যা শুধু একটা নয়, অনেকগুলো। একটা সমাধান করতে না করতেই আরেকটা এসে হাজির হয়। জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

বাবা শহরের নামকরা বাবুর্চি। টাকা পয়সার অভাব নেই। কিন্তু হায়, টাকা দিয়ে যদি মেয়েটাকে সুখ কিনে দিতে পারতেন! এখন মেয়েকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবেন?

কান্না থামলে বাবা মেয়ের হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। তিনটা চুলায় একসাথে আগুন জ্বালিয়ে তিনটা ছোট পানিভর্তি পাতিল তুলে দিলেন। পানি টগবগ করে ফোটা শুরু করলে, একটাতে আলু দিলেন, একটাতে দিলেন ডিম, তৃতীয়টাতে চায়ের পাতা ছেড়ে দিলেন।

সেগুলোকে সেদ্ধ হতে সময় দিলেন। মেয়ে অবাক দৃষ্টিতে চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। বাবাও মুখে কিছু বলছেন না।

মিনিট বিশেক পর বাবা চুলা বন্ধ করে দিলেন। আলু আর ডিম আলাদা আলাদা প্লেটে রাখলেন। একটা কাপে চা ঢেলে নিলেন। এবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন,

মা, কী দেখতে পাচ্ছো?

আলু, ডিম আর চা।

বাবা বললেন,

কাছে এসে আলুগুলোকে ধরে দেখো।

মেয়ে দেখল আলুগুলো নরম।

এবার একটা ডিম নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে দেখো। মেয়ে খোসা ছাড়িয়ে ভেতরে দেখল শক্ত সিদ্ধ ডিম। এবার চায়ের কাপটাতে চুমুক দাও। চায়ের সুগন্ধে মেয়ের মুখে হাসি ফুটলো। মেয়ে বাবাকে বললো:

বাবা! এ কাজগুলো কেনো করেছো?

এতক্ষণ যা করলাম, এখন তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলি।

আলু, ডিম আর চায়ের পাতা তিনটাকেই একই পরিবেশে রেখেছি, সমান তাপমাত্রার গরম পানিতে রেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকটার পরিবর্তন (প্রতিক্রিয়া) হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন।

আলু ছিলো শক্ত, পুরু আর অগলনযোগ্য কিন্তু ফুটন্ত পানিতে পড়ে নরম আর দুর্বল হয়ে গেছে।

ডিমটা ছিলো ভঙ্গুর। উপরের পাতলা আবরণ ভেতরের তরল পদার্থকে সুরক্ষা দিচ্ছিলো। কিন্তু গরম পানিতে দেয়ার পর দেখা গেলো ভেতরের তরল শক্ত হয়ে গেছে।

চায়ের পাতাগুলো ছিলো গুঁড়োগুঁড়ো। গরম পানিতে দেয়ার পর সেগুলোর কোনও রদবদল তো হলোই না, উল্টো পানিকেই বদলে দিলো, এবং নতুন একটা বস্তু (চা) তৈরি করলো।

মা, তুমি কোন্‌টার মতো হবে? যখন বিপদ-দুঃখ-দুর্দশা তোমার দরজায় করাঘাত করে তুমি কিভাবে সাড়া দিবে?

গরম পানির প্রভাবে আলুর মতো গলে যাবে? না ডিমের মতো ভেতরে শক্ত হয়ে যাবে, নাকি চায়ের মতো নিজেকে না বদলে আশপাশকে বদলে নতুন পরিবেশ তৈরি করবে?

দেখো মা!

আমাদের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে। অনেক কিছুই আমাদেরকে নিয়ে ঘটে। এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের ভেতরে কী ঘটে সেটা।

মা মণি!

বাইরের প্রভাবে নিজে না বদলে গিয়ে, ভেতরের প্রভাবে বাহিরকে বদলানোই আসল কাজ।

জীবন জাগার গল্প: ২২

নবীর সঙ্গী

একবার মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলেন, ইয়া রাব্বি! জান্নাতে আমার সঙ্গী কে হবে তাকে একটু দুনিয়াতে দেখতে চাই।

দুদিন পর জিবরাঈল আসলেন। মুসাকে বললেন, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হবে অমুক। সে অমুক জায়গায় বাস করে।

মুসা (আ.) পরদিন তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন একজন যুবক বসে আছে। যুবকের মধ্যে বিশেষ কিছু চোখে পড়লো না। সারাদিন যুবকটির উপর চোখ রাখলেন। কিন্তু একজন নবীর প্রতিবেশী হওয়ার মতো কোনও গুণপনা লোকটির মধ্যে খুঁজে পেলেন না।

বিকেলে পেশাগত কাজ সেরে যুবকটি বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। মুসা (আ.)ও তার পিছু নিয়ে তার দোরগোড়ায় উপস্থিত হলেন। এক রাতের আতিথ্য কামনা করলেন।

যুবকটি প্রার্থনা মঞ্জুর করল। মুসা (আ.) দেখলেন যুবকটি এক বৃদ্ধা মহিলার সেবায় নিয়োজিত হলো।

বৃদ্ধাকে মুখে খাবার তুলে খাইয়ে দিচ্ছে। জামাকাপড় পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আর মহিলাটি বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে কীসব বলে যাচ্ছে।

মুসা (আ.) আর থাকতে না পেরে যুবকটির কাছে জানতে চাইলেন। কে এই বৃদ্ধা, আর তিনি বিড়বিড় করে বলছেনই বা কি?

যুবকটি বলল, ইনি আমার মা। আমি তাঁর দেখাশোনা করি। খিদমাত করি। তিনি প্রতিদিন আমার জন্য দু'আ করেন। তিনি প্রতিদিন একই দু'আ করেন, বলেন,

'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন। আর জান্নাতে তোমাকে মুসার সঙ্গী করে দিন।

মুসা (আ.) উত্তর শুনে কেঁদে ফেলে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। জান্নাতে তুমিই আমার সঙ্গী হবে।

জীবন জাগার গল্প: ২৩

গায়েবের জ্ঞানী

একজন লোক দাবি করতো সে গায়েব জানে। এ নিয়ে তার বাগাড়ম্বরে টেকাই দায় হয়ে পড়েছিলো। সে বড় বড় আলিমদেরকে মুনাজারায় আহ্বান জানালো। আলিমগণ তার ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। মুনাজারার তারিখ নির্ধারণ করা হলো। স্থানও নির্ধারণ করা হলো।

মুনাজারার দিন ময়দান লোকে লোকারণ্য। সবাই মুনাজারা দেখতে এসেছে। উভয় পক্ষই সপারিষদ হাজির হলো। একজনকে সালিশ নির্ধারণ করা হলো।

মুনাজারা শুরু। আলিমগণের আমীর বললেন,

আমরা মুনাজারা শুরু করলাম। তবে একটি শর্ত আছে।

ভণ্ড লোকটি বলল, কী শর্ত?

আলিম বললেন, মুনাজারা শেষ। আমরা জিতে গেছি।

জীবন জাগার গল্প: ২৪

ঈর্ষাকাতরতা

আব্দুল কাদির জীলানি (রহ.) খানকায় বসে আছেন। এমন সময় এক মহিলা আসলো। আপাদমস্তক বোরকাবৃতা। মহিলাটি অভিযোগের স্বরে বললো:

আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান না করলে, আমি আমার চেহারা অনাবৃত করে দেখাতাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কতটা সৌন্দর্য দান করেছেন। কিন্তু তারপরও আমার স্বামী আরেক মহিলাকে বিয়ে করেছে।

মহিলাটির কথা শুনে আব্দুল কাদির জীলানি (রহ.) থরথর করে কেঁপে উঠে বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

মুরীদানে কিরাম হয়রান হয়ে গেলেন, শায়খ বেহুঁশ হয়ে গেলেন কেনো?

হুঁশ ফিরে এলে তাঁকে বেহুঁশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তর দিলেন,

একজন মাখলুক যদি তার মহব্বতের ব্যাপারে শিরক সহ্য করতে না পারে, তাহলে খালিক (স্রষ্টা) কিভাবে সহ্য করবেন?

জীবন জাগার গল্প: ২৫

গোপন বৈঠক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো।

বৈঠক শেষে দুজন বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য ডায়াসে এসে দাঁড়ালেন।

সাংবাদিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, মিস্টার প্রেসিডেন্ট!

স্যার : নতুন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন কি?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাশে দাঁড়ানো ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী খুক করে কেশে উত্তর দিলেন,

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এক মিলিয়ন মুসলমানকে হত্যা করবো, এবং একটি বিড়াল হত্যা করবো।

উপস্থিত সাংবাদিকরা সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠলো,

কেনো, একটি বিড়াল কেনো?

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী মিটিমিটি হেসে, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কী আমি বলিনি বাজি না ধরতে? এবার বিশ্বাস হলো তো! সাংবাদিকদের কাছে এক মিলিয়ন মুসলিমের চেয়ে একটি বিড়ালের মৃত্যুই বেশি গুরুত্ব পাবে?

(গল্পটি কাল্পনিক, কিন্তু বাস্তবতা এরচে' ভিন্ন নয়)

জীবন জাগার গল্প: ২৬

ইয়াতীমের সেবা

এক বুযুর্গের প্রতিবেশি শরাবখোর-মদদী ছিল। ভয়ংকর মাতাল-দাতাল। বুযুর্গ অনেক নসীহত-উপদেশ দিলেন। যে কে সেই। কোনও ফল হলো না।

এক সাত সকালে শরাবির বউ এসে বললো:

আমার স্বামী ইন্তিকাল করেছেন, আপনি যদি তার জানাযাটা পড়াতেন?

বুযুর্গ বললেন না, আমি এই শরাবির জানাযায় যাবো না।

রাতে বুযুর্গ স্বপ্নে দেখলেন, শরাবি লোকটি জান্নাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি অবাক হলেন। লোকটিকে বলতে শুনলেন,

জান্নাত কিন্তু তোমার হাতে নয়, আল্লাহর হাতে।

বুযুর্গ সকালে উঠে শরাবির স্ত্রীর কাছে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন,

লোকটি সপ্তাহে একদিন, কিছু ইয়াতীম বাচ্চাকে খাবারের দাওয়াত দিতো। তাদেরকে বিদায় দেয়ার সময় বলতো, তোমাদের এই চাচার জন্য দু'আ করো।

জীবন জাগার গল্প: ২৭

দাম্পত্য রহস্য

স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হলো। স্বামীর রূঢ় ব্যবহার স্ত্রীকে বড় বেশি আহত করলো। স্ত্রী অভিমানভরে একটা ব্যাগে জামাকাপড় গোছাতে শুরু করে দিলো। মায়ের কাছে চলে যাবে।

স্বামী বিষয়টা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লো। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, রুক্ষ আচরণের কথা ভেবে অনুতাপ বোধ করলো।

দ্রুত উঠে গিয়ে স্ত্রীর কাছে কাতরভাবে ক্ষমা চাইলো। মিষ্টি হাসিতে স্ত্রীর সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে শুরু করলো। নানাভাবে তাকে খুশি করতে চেষ্টা করলো। এক সময় স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটলো। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো:

– তুমি কী করছিলে?

– গরমের কাপড় ভাঁজ করে রেখে দিচ্ছি আর শীতের কাপড়গুলো বের করে রাখছি। শীত তো এসেই পড়লো।

জীবন জাগার গল্প: ২৮

নিরহংকার প্রেসিডেন্ট

আলিয়া ইজ্জত বেগোভিচ। বসনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। সবসময় প্রথম কাতারে নামায পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন।

একদিন জুমু'আর নামাযে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলো। উপস্থিত মুসল্লিরা তাঁকে দেখে সামনে যাওয়ার জন্য পথ করে দিলো। তিনি পেছনেই বসলেন।

মুসল্লিদের দিকে ফিরে রাগতস্বরে বললেন:

এভাবেই তোমরা তোমাদের অত্যাচারী, একনায়ক, স্বৈরাচারী শাসকদের তৈরি করো।

জীবন জাগার গল্প: ২৯

ভণ্ডনবী

এক কাদিয়ানি তার ধর্মের দাওয়াত দিতে বের হলো। পথিমধ্যে দেখা পাওয়া এক হিন্দুকে মুসলমান ভেবে বসলো। লোকটাকে তার ভণ্ড নবীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলো। মির্জা গোলাম আহমাদ সম্পর্কে বললো,

তিনি নবী ছিলেন। এই ছিলেন, সেই ছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন বলো, তুমি আমাদের নবীর প্রতি ঈমান আনবে কি না?

হিন্দু লোকটি প্রথমে একচোট হেসে নিলো। তারপর হাসি থামিয়ে বললো:

আরে মিয়া! আমি এখন পর্যন্ত সত্য নবীর প্রতিই ঈমান আনি নি। আর তুমি কোথাকার কোন ভণ্ড নবীর দাওয়াত নিয়ে এসেছো।

জীবন জাগার গল্প: ৩০

Show (শো)

বক্তব্যের ময়দানে সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর বক্তব্যে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যেতো। তার জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে হিন্দুরাও আলোড়িত হতো। দলে দলে হিন্দু মুসলমান হয়ে যেতো। আজীবন তিনি ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে অসামান্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উপস্থিত জওয়াবের অপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বিস্ময়কর ছিলো তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

একবার এক লোক বললো হযরত, আপনি তো ইংরেজদেরকে শো (Show: তামাশা) দেখিয়ে ছাড়ছেন।

শাহ সাহিব তৎক্ষণাৎ বললেন ভাই! আমি ইংরেজদেরকে শো (Show) দেখাই না। আমি তাদেরকে সু (Shoe: জুতা) দেখাই।

জীবন জাগার গল্প: ৩১

ডায়রিয়া

একবার শাহ সাহেবের সাথে মাওলানা মওদূদির দেখা।

মাওলানা মওদূদি টিপ্পনী কেটে, শাহ সাহেবকে বললেন: শাহ সাহাব! আ-প কি জামাত কো তাকরীর কী বড়া হায়জা হ্যায় (শাহ সাহেব! আপনার দলের তো বক্তব্যের বড়সড় ডায়রিয়া হয়েছে দেখি)।

শাহ সাহেব ত্বরিত জবাব দিলেন:

য্যয়সে আ-প কী জামাত কো তাহরীর কা হায়জা হ্যায় (যেমনটা আপনার দলের লেখনীর ডায়রিয়া হয়েছে)।

জীবন জাগার গল্প: ৩২

জীবন সফর

এক লোক শাহ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন,

হযরত, জীবন কেমন কাটলো?

তিনি জওয়াব দিলেন, ভাই! আধী রেল মেঁ গুজরি আওর আধী জেল মেঁ। (অর্ধেক রেলে আর অর্ধেক জেলে কেটেছে)।

জীবন জাগার গল্প: ৩৩

বে-হিসাব

এক জলসায় মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলো। শাহ সাহেব মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়কে কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করলেন।

তিনি অঙ্কের ছোট একটা প্রশ্ন করলেন। হিন্দুরা উত্তর দিতে পারলেও মুসলমানরা পারল না। মুসলমানদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

শাহ সাহেব কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলে উঠলেন, আহ! মুসলমানরা দুনিয়াতেও বে হিসাব। আর আখিরাতেও বে হিসাব।

জীবন জাগার গল্প: ০৪

ফাসলুল খিতাব

দেওবন্দ আর আলীগড়ের মতাদর্শগত বিরোধ তখন তুঙ্গে। এই সময় একবার কোনো এক অনুষ্ঠানে, সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) আলীগড় গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে অপূর্ব বাগ্মিতা দান করেছিলেন।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে একজোট হয়ে ঠিক করলো শাহ সাহেবকে বক্তব্য দিতে দেয়া যাবে না। তিনি বক্তব্য দিলেই সবাই দেওবন্দের অনুসারী হয়ে যাবে। শাহ সাহেব মঞ্চে উঠলেন। দুষ্ট ছেলেগুলো শোরগোল শুরু করে দিলো।

শাহ সাহেব বললেন: ভাইয়েরা আমি লম্বা সফর করে এসেছি। শুধু একটা কথা শোনো,

যদি তোমরা অনুমতি দাও আমি শুধু কুরআন কারীম থেকে একটা রুকু তিলাওয়াত করে শোনাবো।

ছাত্রদের মধ্যে দু'দল হয়ে গেলো। একদল বললো শুধু কুরআন তিলাওয়াত হলে কোনও সমস্যা নেই। আরেক দল বললো, না না কুরআন তিলাওয়াতও চলবে না।

তিলাওয়াতের পক্ষে দল ভারী হলো। তারা বললো:

জ্বী, আপনি একটা রুকু শুনিয়ে দিন। তার বেশি নয়।

শাহ সাহেব এক রুকু তিলাওয়াত করে বললেন,

প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা! যদি অনুমতি দাও পঠিত রুকুটার তরজমাটা পেশ করি?

ছাত্রদের উপর শাহ সাহেবের তিলাওয়াতের এমন গভীর প্রভাব পড়লো যে, তারা মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলো। এরপর শাহ সাহেব প্রায় দুই ঘণ্টা বয়ান করলেন, কেউ টুঁ শব্দটিও করলো না।

জীবন জাগার গল্প: ৬৫

চোরের হৃদয় চুরি

এক চোর চুরির উদ্দেশ্যে মালিক বিন দীনার (রহ.) এর ঘরে ঢুকলো। আঁতিপাতি করে খুঁজেও ঘরে চুরি করার মতো কিছু পেলো না।

চোর মরিয়া হয়ে ইতিউতি তাকাতে গিয়ে দেখলো, এক কোণে মালিক (রহ.) তন্ময় হয়ে নামায পড়ছেন।

মালিক (রহ.) সালাম ফিরিয়ে চোরের দিকে তাকিয়ে বললেন,

দুনিয়ার সামগ্রী চুরি করতে এসেছো, কিছু তো পেলে না।

আখিরাতের কোনো সামগ্রী কি তোমার কাছে আছে?

না, নেই। চোর বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলো।

তাহলে আমার কাছে এসে বসো।

চোর গুটিগুটি পায়ে গিয়ে বসলো।

ফজরের সময় হলে দু'জন একসাথে মসজিদে গেলেন। মুসল্লিরা দেখে অবাক হলো। বলাবলি করতে লাগলো, যুগের সেরা আলিমের সাথে চোর!

তারা মালিক (রহ.) এর কাছে ঘটনাটা কী, জানতে চাইলো।

মালিক (রহ.) উত্তর দিলেন:

সে আমার সম্পদ চুরি করতে এসেছিলো। আমি তার হৃদয় চুরি করে ফেলেছি।

জীবন জাগার গল্প: ৬৬

সুবুদ্ধি!

দুই বন্ধুর কথোপকথন:

প্রথম বন্ধু: দোস্ত! এমন একটা পথ বাতলে দাও, যাতে মানুষ সবসময় আমাকে মনে রাখে।

দ্বিতীয় বন্ধু: তুমি সবার থেকে ধারকর্জ নাও। তাহলেই হবে।

জীবন জাগার গল্প: ৩৭

নজরের হিফাজত

এক যুবক তার উস্তাযের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো। আমি রাস্তায় বের হলে বেগানা নারীর দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারি না। বারবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারছি না। এর সমাধান কী?

উস্তায তাকে কানায় কানায় ভর্তি একটা দুধের গ্লাস দিয়ে বললেন;

এই গ্লাসটা হাতে করে, বাজার পার হয়ে, অমুক জায়গায় গিয়ে আবার ফিরে আসো। সতর্ক করে দিলেন, গ্লাস থেকে এককোঁটা দুধও যেনো ছলকে না পড়ে।

আরেক জনকে তার পিছু পিছু পাঠালেন। তার হাতে একটা লাঠি দিয়ে বললেন, সামান্য দুধ ছলকে পড়লেই সবার সামনে ঠাস করে বাড়ি দেবে।

ছাত্রটি কোনো দিকে না তাকিয়ে, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছলো। আবার ঠিকঠাক মতো ফিরে আসলো।

উস্তাজ জানতে চাইলেন,

কয়জন বেগানা নারীর উপর চোখ পড়লো?

উস্তাদজী! আসা যাওয়ার পথে, আমার চোখে কিছুই পড়েনি। দুধ ছলকে পড়লে লাঠির বাড়ি খেতে হবে এবং সবার সামনে লাঞ্ছিত হতে হবে এই ভয়ে তটস্থ ছিলাম। দৃষ্টি সবসময় দুধের গ্লাস আর সামনের পথের উপরই নিবদ্ধ ছিলো।

উস্তায বললেন: মুমিনের অবস্থাও এমন হওয়া উচিত। মুমিন পাপে লিপ্ত হলে, আল্লাহর শাস্তির ভয়। কিয়ামতের দিন সবার সামনে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়। প্রকৃত মুমিনের দৃষ্টি সবসময় শেষ দিনের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাই গুনাহের দিকে তার নজর পড়ে না।

সতর্ক হও, দৃষ্টি অবনত রাখ।

জীবন জাগার গল্প: ৩৮

আল কায়দা

এক মার্কিন সৈন্য টহলে বের হলো। সামনে এক আফগান শিশুকে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলো,

তুমি কি আল কায়দা?

নাহ, কায়দা তো আমি সেই গত বছরই খতম করে ফেলেছি। এখন আমপারা খতম করছি।

কী, আমেরিকা খতম করছ?

না না, ত্রিশ নাম্বার পারা।

জীবন জাগার গল্প: ৩৯

পিতৃস্নেহ

এক বন্ধুর বর্ণনা,

সদ্যোজাতক মারা গেলো। রোরুদ্যমান পিতা সন্তান কোলে গাড়িতে বসলো। গাড়ি কবরস্থানের দিকে চললো। আমিও গাড়িতে চড়ে বসলাম। পিতাকে দেখলাম কোলের মৃত সন্তানের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। পিতার দু'চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। রাস্তার বাঁক ঘুরতেই সূর্যের তাপ সরাসরি এসে মৃত শিশুটির গায়ে পড়ল। পিতা রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য, নিজের গায়ের কোট খুলে, সন্তানের গায়ের উপর ধরলো। হায় আল্লাহ!

স্নেহকাতর পিতা ভুলে গেছে, তার সন্তান মৃত। সন্তানের প্রতি একজন পিতার মমত্ব দেখে, আমার হু হু করে কান্না আসলো। অজান্তে মুখ দিয়ে বের হলো:

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা।

জীবন জাগার গল্প: ৪০

অহংকারের ওষুধ

আল্লামা শা'রাভি মিসরি (রহ.)। হাল আমলের প্রখ্যাত মুফাসসির। তার কুরআন কারীমের দরসগুলো হতো অত্যন্ত প্রাণবন্ত আর জ্ঞানেগুণে অফুরন্ত। তিনি বললেন,

একদিন দরস পেশ করছিলাম। অন্য দিনের তুলনায় সেদিনের তাকরীর (লেকচার) একটু বেশি রকমেরই ভালো হয়ে গিয়েছিলো। মানুষের নাড়াসাড়া দেখে মনে গর্ববোধ হলো।

দরস শেষে গাড়ি করে বাসায় ফিরছি। সামনে একটা মসজিদ দেখে চালককে বললাম,

গাড়ি থামাও, মসজিদে যাবো।

শায়খ! এখনো তো নামাযের সময় হয় নি।

তা না হোক, তুমি গাড়ি থামাও (পার্ক করো)।

আমি মসজিদের হাম্মামে (বাথরুমে) গেলাম। একটা একটা করে সবগুলো হাম্মাম পরিষ্কার করলাম। এরপর গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

-ওখানে কী করেছেন?

-নাফসটা একটু উল্টোপাল্টা (বেগড়বাই) করেছিলো, একটু সবক দিয়ে এলাম। ওটা নিজেকে উঁচু মনে করেছিলো, নিচে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করলাম। মনটাকে নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দিলে ওটা লাগামহীন আচরণ করতে শুরু করে দেয়।

জীবন জাগার গল্প: ৪১

ছলনা

এক লোক ঘর সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ আর বীতস্পৃহ হয়ে গেলো। নারী জাতির নানা ছলনার শিকার হয়ে, তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় মন রি রি করতে লাগলো। ঘর-বাড়ি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

যেতে যেতে গ্রামের শেষ প্রান্তের পাতকুয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কুয়ায় বালতি ফেলে এক মহিলা পানি তুলছিলো। মহিলাটিকে দেখে সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। গুটি গুটি পায়ে

কাছে গিয়ে পানি চাইলো, পানি পানের ফাঁকে, একথা সেকথার পর সে বললো,

আচ্ছা! নারীদের কৌশল আর ছলনা বিষয়টা কেমন আর তা থেকে বাঁচার উপায় বাতলাতে পারো?

সত্যি সত্যিই জানতে চাও?

হ্যাঁ।

মহিলাটি হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। ওরে বাবারে! মরে গেলামরে! বাঁচাও বাঁচাও।

আরে ! আরে ! তুমি চিৎকার করছো কেনো?

যাতে গ্রামের লোকেরা এসে তোমাকে হত্যা করে!

সে কি? কেনো? আমি তো তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য এখানে আসি নি। তুমি সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও আমি কোন মন্দ আচরণ করি নি।

দেখো, তোমাকে দেখে বুদ্ধিমতী, দয়ালু আর অভিজ্ঞ মনে হয়েছে, তাই তোমার কাছে প্রশ্নটা করলাম।

মহিলাটি চিৎকার থামাল। দূর থেকে দেখা গেলো, গ্রামের লোকেরা ছুটে আসছে। মহিলাটি এবার কূপ থেকে পানি তুলে নিজের গায়ে ঢেলে, পুরো শরীর ভিজিয়ে ফেললো।

গ্রামের লোকেরা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো কী হয়েছে? আমি কূপে পড়ে গিয়েছিলাম, এই লোকটি আমাকে বাঁচিয়েছে।

সবাই লোকটিকে বাহবা দিল, পুরস্কৃত করল। লোকেরা চলে গেল।

তোমার এই অদ্ভুত আচরণের রহস্য কী?

মহিলারা এমনি হয়, তাদেরকে কষ্ট দিলে তোমাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না। খুশি রাখলে তোমাকে সুখী রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না।

জীবন জাগার গল্প: ৪২

আল্লাহর অস্তিত্ব

একদল লোক ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর দরবারে এসে প্রশ্ন করলো, আল্লাহ যে আছেন এর প্রমাণ কী?

তিনি সামান্য চিন্তা করে বললেন,

তূত গাছের পাতা।

তূত গাছের পাতা? সেটা কী করে সম্ভব! এই পুঁচকে এক পাতা কিভাবে এমন মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে?

তূত গাছের পাতার স্বাদ ও রস এক। কিন্তু সেই পাতা রেশম পোকা খেলে বের হয় রেশম। মৌমাছি খেলে বের হয় মধু। হরিণ খেলে বের হয় মিশকে আম্বর।

কে এই একটি মূল বস্তু থেকে তিনটি ভিন্ন বস্তু বের করলেন?

তিনি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা।

জীবন জাগার গল্প: ৪৩

বাহাদুর সাহাবা

এক রাফেজি (শী'য়া) আবু হানীফা (রহ.) এর দরবারে এসে প্রশ্ন করলো:

-সবচেয়ে বাহাদুর সাহাবা কে?

-আমাদের (সুন্নি) মতে হযরত আলী (রা.)। কারণ তিনি জানতেন আবু বাকারের (রা.) খিলাফত সত্য। তাই আলী (রা.) আবু বকরকে খিলাফাতের দায়িত্ব সোপর্দ করেছিলেন।

আর তোমাদের (শী'য়াদের) কাছে সবচেয়ে বাহাদুর সাহাবা হলেন আবু বকর (রা.)। কারণ তোমাদের মতে খিলাফত আলীর হক। কিন্তু তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেও আবু বকর থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নিতে পারেন নি।

শী'য়াটি আর কিছু না বলে চলে গেলো।

জীবন জাগার গল্প: ৪৪

গণকের গণনা

বাদশাহ দরবারের গণকের কাছে জানতে চাইলেন, আমার জীবনের আর কতদিন বাকি আছে? আর মাত্র দশ বছর আছে।

বাদশাহ সীমাহীন পেরেশান হয়ে গেলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। আর মাত্র এই ক'টা বছর বাঁচবো?

সবাই মিলে উজিরকে ধরলো। আপনি একটা উপায় বের করুন। এভাবে চলতে থাকলে তো রাজ্যপাট সব উচ্ছন্নে যাবে।

উজির সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন। বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরদিন দরবারে সবাই হাজির। রাজা বিষণ্ণচিত্তে বসে আছেন। উজির দাঁড়িয়ে গণককে প্রশ্ন করলেন:

তুমি বলেছো আমাদের জাঁহাপনা আর দশ বছর বাঁচবেন?

জ্বি

তুমি কত বছর বাঁচবে?

বিশ বছর।

উজীর তলোয়ার বের করে গণককে হত্যা করে রাজাকে বললেন:

জাঁহাপনা! মিথ্যুকের কথা বিশ্বাস করে লাভ নেই।

জীবন জাগার গল্প: ৪৮

ঈমান

শায়খ আরীফি বর্তমানে একজন আলোচিত দা'ঈ। তার আরবি বয়ান সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। তিনি এক ঘটনা বললেন:

আমি এক মজলিসে বয়ান করছি। সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। প্রশ্নোত্তর পর্বে এক যুবক ফোন করে বললো:

-শায়খ! আলহামদুলিল্লাহ, আমি তাওবা করেছি। কিন্তু আগে যার সাথে সম্পর্ক ছিল তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

-আপনি এই দু'আ বেশি বেশি পড়ুন:

হে আল্লাহ আপনি আমার অন্তরে ঈমান বসিয়ে দিন। আমার শ্রবণে ঈমান বসিয়ে দিন। আমার মুখে ঈমান বসিয়ে দিন। আমার পথে ঈমান বসিয়ে দিন।

-শায়খ! একটু শুনুন, আমার পূর্বের মা'শুকার নামও ঈমান।

-শায়খ বললেন, একথা শুনে আমার এমন হাসি পেলো যে, শেষ পর্যন্ত সম্প্রচার বন্ধ করে দিতে হলো।

জীবন জাগার গল্প: ৪৬

গাড়ির চাকা

পরীক্ষা চলছে। শিক্ষক দেখলেন, ক্লাসের তিন দুষ্ট ছেলের কোনওটাই নেই। পরীক্ষার শেষ সময়ে তিনবন্ধু আসলো। গায়ের জামা ছেঁড়া। কাদাযুক্ত। পুরো শরীরের এখানে সেখান ধুলোবালি।

তোমাদের আসতে দেরি হল কেনো?

স্যার! আমরা এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলাম। আসার পথে গাড়ির একটা চাকা ফেটে যায়। তেলও ফুরিয়ে গিয়েছিলো। অতিরিক্ত চাকাও ছিলো না। আমরা পায়ে হেঁটেই এতদূর পথ এসেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের আজ আর পরীক্ষা দিতে হবে না। আগামীকাল দিবে।

পরদিন তিনজনকে তিন কোণে বসালেন। প্রশ্নপত্র দিলেন।

প্রশ্নপত্রে দু'টি প্রশ্ন ছিলো:

তোমার নাম কি (একশতে দশ নাম্বার)।

কোন চাকাটা ফেটে গিয়েছিলো (একশতে নব্বই)।

জীবন জাগার গল্প: ৪৭

আম্মু কবি

ফারাযদাক। বিখ্যাত আরব কবি। একজন তাবেয়ি। তিনি একবার, একটি ছোট ছেলেকে দুষ্টুমি করে বললেন:

আমি যদি তোমার আব্বু হয়ে যাই তাহলে কেমন হয়?

না না, আমার আব্বু আছেন। আপনি আমার আম্মু হয়ে যান। আপনি তো কবি, আব্বু আপনার সুন্দর সুন্দর কথা শুনে খুশি হবেন।

শৈশবে, ফারাযদাককে তার আব্বা সাথে করে নিয়ে গেলেন– হযরত আলীর (রা.) দরবারে।

এটা আমার ছেলে। সে একজন কবি।

আহ, সে যদি কবি না হয়ে হাফিযে কুরআন হতো, তাহলে কতইনা উত্তম হতো!

ফারাযদাক বলেন, তারপর আমি শপথ করলাম, হাফিযে কুরআন না হয়ে ঘর থেকে বের হবো না।

তিনি তাই করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দিয়েছিলেন।

জীবন জাগার গল্প: ৪৮

পাখির প্রেম

একটি ফুটফুটে সুন্দর পাখি এক শাদা গোলাবের প্রেমে পড়লো। একদিন প্রেমিক পাখি তার প্রেমিকা গোলাবিকে বললো:

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমি তো তোমাকে ভালোবাসি না!

পাখিটি দমে না গিয়ে প্রতিদিন এভাবে ভালোবাসার কথা বলে যেতে লাগলো। শেষে একদিন গোলাবি বললো:

আমি এক শর্তে তোমাকে ভালবাসতে রাজি।

কী শর্ত?

যেদিন আমার রং লাল হবে, সেদিন আমি তোমাকে ভালোবাসবো।

পাখিটি পরদিন এসে তার ডানা কেটে ফেললো। ডানার রক্তগুলো দিয়ে সাদা ফুলটাকে রক্তে লাল করে দিলো।

গোলাবটি বুঝতে পারলো, পাখিটি তাকে কত গভীরভাবে ভালোবাসে। কিন্তু তখন আর সময় ছিলো না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে পাখিটি মারা গিয়েছে।

জীবন জাগার গল্প: ৪৯

পরিচ্ছন্নতা

ইউরোপের এক দেশে। একটি ওয়াশরুমে (গণশৌচাগার) একজন মুসলিম যুবক যোহরের ওযু করছে। এরমধ্যে সেখানে এক ইহুদি যুবকও এসে ঢুকলো।

ইয়াহুদি যুবকটি বললো:

তোমরা মুসলমানরা বড্ড নোংরা। তোমাদের নোংরা পাগুলো পরিষ্কার জায়গাগুলোতে যত্রতত্র রাখো। আমরা যেখানে হাত-মুখ ধুই সেখানে তোমরা নোংরা পাগুলো ধোয়া শুরু করো।

মুসলিম যুবকটি তাকে প্রশ্ন করলো:

তুমি দিনে কয়বার চেহারা ধোও?

যুবকটি এমনতরো খাপছাড়া প্রশ্নে কিছুটা অবাক হলেও উত্তর দিলো:

সকালে একবার ধুই। আবার কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে দু'বারও ধোয়া হয়।

মুসলিম যুবকটি বললো:

আমরা দিনে পাঁচবার পা ধুই।

এখন বলো দেখি, কোনটা বেশি পরিচ্ছন্ন, আমার পা নাকি তোমার চেহারা?

জীবন জাগার গল্প: ৫০

যেমন কর্ম তেমন ফল

হজে বের হওয়া এক বেদুইন পিতার স্মৃতিচারণ:

আমার যুবক ছেলের সাথে হজের সফরে বের হলাম। বয়সজনিত কারণে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা। তখনকার দিনে লোকেরা উটের পিঠে সওয়ার হয়েই হজে যেতো।

আমরা পিতাপুত্রও একটি কাফেলার সাথে জুটে গেলাম। আমরা রওয়ানা দিয়েছিলাম রামাল্লা থেকে। পথিমধ্যে একদিন সন্ধ্যার আগমুহূর্তে, সূর্য ডুবি ডুবি করছে, এমন সময় আমি ছেলেকে বললাম:

বেটা! আমি একটু প্রয়োজন সারব। তুমি কাফেলার সাথে চলতে থাকো। আমি প্রয়োজন সেরেই কাফেলার সাথে যোগ দেবো।

কাফেলা চলে গেলো।

অনেকক্ষণ পর ছেলে দেখলো, তার পিতা এখনো এলেন না। সে তৎক্ষণাৎ কাফেলাকে সামনে চলতে বলে দৌড়ে পেছন দিকে এলো।

এসে দেখলো,

পিতা কিছুদূর হেঁটে ক্লান্তিতে বসে আছেন। ছেলে ছুটে গিয়ে বাবাকে কাঁধে তুলে হাঁটা দিলো। কিছুদূর যাওয়ার পর, ছেলে দেখলো তার মাথা বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে মনে করে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে সে অনুভব করলো:

তার মাথা বেয়ে পড়া পানিটা অন্য কিছু নয়, পিতার চোখের অশ্রু।

ছেলে বললো:

ইয়া আবি! (আব্বু!) আপনি আমার কাঁধে একটা পাখির পালকের মতোই হালকা। আমার কোনও কষ্টই হচ্ছে না।

পিতা বললেন:

বেটা আমার! আমি সে কারণে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি পঞ্চাশ বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে করে:

পঞ্চাশ বছর আগে, ঠিক এই জায়গা থেকেই তোমার দাদাকে আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। তাঁর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো দেখে।

জীবন জাগার গল্প: ৮১

জান্নাতের মাটি

ইয়েমেনের রাজধানী সানআ। শহরতলির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গল্প বলার ক্লাসে ম্যাডাম প্রবেশ করলেন।

আজ তোমাদেরকে কোনও গল্প শোনাবো না। আজ আমি তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দেবো।

কী কাজ, আপুমণি?

তোমাদের কাজ হলো, তোমাদের মাঝ থেকে যেই আগামীকাল আসার সময় জান্নাতের এক মুঠো মাটি আনতে পারবে সেই পুরস্কার পাবে।

পরদিন ক্লাসে:

কেউ মসজিদের মাটি এনে জমা দিলো। কেউ বড় বুযুর্গের কবর থেকে মাটি এনে জমা দিলো। কেউ কেউ তো মক্কা শরীফের মাটি এনেছে বলেও দাবি করলো।

একটি মেয়ে জড়োসড়ো পায়ে এসে মাটি জমা দিয়ে বললো:

আপু আমি তো অন্য কোনও জায়গার মাটি আনতে পারি নি, আমি আমার বাড়ির মাটিই নিয়ে এসেছি।

তোমার বাড়ির মাটি কিভাবে জান্নাতের মাটি হয়?

না না, আপুমণি! ঠিক আমাদের বাড়ির মাটি নয়, আমি এনেছি আম্মুর পায়ের নিচের মাটি।

কেনো তোমার মনে হলো, এটা জান্নাতের মাটি?

কেনো, আপনিই তো বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচেই সন্তানের জান্নাত।

জীবন জাগার গল্প: ৫২

ভাষার পার্থক্য

নিউ ইয়র্কের এক ব্যাস্ত সড়কের ফুটপাত। একজন অন্ধ মানুষ বসে আছে। পাশে ছোট্ট একটা কাঠের ফলকে লেখা:

আমি একজন অন্ধ। আমাকে সাহায্য করুন।

দিন গড়িয়ে বিকেল হওয়ার পথে। কিন্তু সামনে বিছিয়ে রাখা হ্যাটে কয়েকটি আধুলি ছাড়া কিছুই পড়ে নি।

একজন লোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। দেখলো অন্ধ মানুষটা অসহায়ভাবে বসে আছে, কিন্তু এখনো খাওয়ার টাকাই জোটে নি।

লোকটি পাশে বসলো। কাঠের ফলকটা নিয়ে কিছু একটা লিখে, একটা ডলার হ্যাটে রেখে চলে গেলো।

অবাক করা ব্যাপার, কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যাট ভর্তি হয়ে গেলো। অন্ধ লোকটি বুঝলো কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে।

অন্ধ লোকটি একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো:

ভাই! একটু বলবেন, আমার পাশে রাখা কাঠের ফলকে কী লেখা আছে?

ওমম! ওখানে লেখা আছে:

এখন ঋতুরাজ বসন্ত, কিন্তু আমি বসন্তের সৌন্দর্য দেখতে পারছি না।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩

তাওয়াক্কুল

বিয়ের পর বছর ঘুরে এলো। প্রথমে শ্বশুরের ইন্তিকাল, তারপরে শাশুড়ির স্ট্রোক। নানা কারণে বাপের বাড়িতে নাইওর যাওয়া হয়নি। এবার আর কোনও অজুহাত শুনবো না। স্ত্রী অনুযোগ করে বললো। স্বামী অভয় দিলো, ঠিক আছে তুমি যখন বলবে নিয়ে যাবো।

একদিন সব গোছগাছ করে, নদীপথে রওয়ানা দিলো। গরুর গাড়িতে গেলে ঝাঁকি লাগলে অনাগত নতুন মেহমানের ক্ষতি হতে পারে।

পাল তোলা নৌকা তখন মাঝ দরিয়ায়। কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই চারদিক আঁধার করে ঝড় এলো। ছোট নাও কাগজের নৌকার মতো দুলতে লাগলো।

ভয়ে স্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেলো। প্রাণপণে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করলো। ভরসা পাবার আশায় স্বামীর দিকে তাকালো। দেখলো, স্বামী পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে। অবাক হয়ে জানতে চাইলো:

আপনার ভয় লাগছে না?

না তো, ভয় লাগবে কেনো?

আপনি মানুষ না জ্বিন? এই ভয়ংকর ঝড়, যে কোনও সময় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। শুধু আমরা দু'জন হলে কথা ছিল, সাথে যে আরেক মেহমান আছে?

স্বামী চুপচাপ উঠে গেলো। মাঝির কাছ থেকে একটা ধারালো বটি এনে চোখমুখ লাল করে, বটিটা স্ত্রীর গর্দানের উপর ধরে, জবাই করার ভঙ্গি করলো।

স্বামীর এহেন কাণ্ড দেখে স্ত্রী প্রথমে ভড়কে গেলেও পরে হাসতে লাগলো।

স্বামী বটি রেখে দিলো। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলো:

তুমি ভয় না পেয়ে হাসলে কেনো?

আমি জানি আপনি আমাকে ভালোবাসেন। আপনি কিছুতেই আমাকে জবাই করতে পারেন না।

স্বামী বলল: আল্লাহও আমাদেরকে ভালোবাসেন। তিনি ঝড় পাঠিয়ে আমাদের ক্ষতি করবেন এমনটা হতে পারে না।

জীবন জাগার গল্প: ৫৪

মায়ের মার

পাশাপাশি দু'টি ঘর। এক ঘরে থাকে এক ব্যাংক কর্মকর্তা। ব্যাচেলর।

আরেক ঘরে থাকে এক বিধবা মা আর ছেলে। ছেলে একটা ছোটখাট চাকরি করে, পাশাপাশি পড়াশোনাটাও চালিয়ে যায়।

ছেলে এতবড় হয়েছে, কিন্তু পান থেকে চুন খসলে আর নিস্তার নেই। মা দমাদম দু'চার ঘা বসিয়ে দিতে দেরি করে না। ছেলে প্রতিদিন মায়ের মার খায়। ছেলেটি মাকে বাধা তো দেয়ই না, বরং মার খেতে খেতে, মুখ লুকিয়ে, ঠোঁট টিপে হাসে।

পাশের ঘরের ব্যাংক কর্মকর্তা দ্যাখে আর অবাক হয়। এতবড় ছেলেকে কেউ মারে? আর অমন মার খেয়ে প্রতিদিনই কেউ এভাবে হাসে?

তীব্র কৌতূহল হলেও লোকটা ভদ্রতাবশত এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

একদিন লোকটা ব্যাংক থেকে আগেই ফিরে এলো। এসে দেখলো ভিন্ন চিত্র। আজো মা তার ছেলেকে উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে কিন্তু ছেলেটা হাউমাউ করে কাঁদছে।

বিকেলে এক ফাঁকে, সুযোগ বুঝে ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো:

তোমাকে এতদিন তুমুল মার খেয়েও হাসতে দেখলাম। আর আজ হালকা কয়েকটা কিল খেয়েও অমন করে কাঁদলে?

ছেলেটা বললো:

এতদিন আমার আম্মা আমাকে যে মারতেন, সে মারে বেশ জোর থাকতো। কিন্তু আজ হঠাৎ অনুভব করলাম, তাঁর মারে সেই আগের মতো জোর নেই। তখন আমার মনে হলো, হায় হায়! আম্মা তো বুড়ো হয়ে গেছেন। আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

জীবন জাগার গল্প: ৬৬

অন্ধের প্রজ্ঞা

অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এক অন্ধ লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাতে একটা জ্বলন্ত হারিকেন।

দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক লোক জিজ্ঞাসা করলো:

আপনার কাছে তো রাত আর দিন সমান। বাড়ির রাস্তাও আপনার মুখস্থ। সুতরাং কোনও কিছুর সাথে ঠোকর খাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপরও হারিকেন কেন?

অন্ধ লোকটি উত্তর দিলো:

আমি না হয় কোনও কিছুর সাথে বাড়ি খাবো না, কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা যাতে আমার সাথে ধাক্কা না খায় সেজন্যই হারিকেন হাতে নিয়েছি।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬

কাজের শৃঙ্খলা

একদেশে এক দক্ষ কাঠুরিয়া ছিলো। অমিত দক্ষতার সাথে কাঠ কাটতে পারতো। অন্যদের অর্ধেক সময়ে তার একটা গাছ কাটা হয়ে যেতো।

এক বড় টিম্বার কোম্পানিতে চাকরি নিলো। মনিব তাকে একটা ধারালো কুঠার দিলো।

কাঠুরিয়া মনের আনন্দে কাঠ কাটতে গেলো। প্রথমদিনেই আঠারটা গাছ কেটে ফেললো। বিকেলে হিসেব দেখে মনিব অবাক, এ কী করে সম্ভব! একজন একাই এত গাছ কেটে ফেললো?

মনিব পরদিন হিসেব করে দেখলো, কাঠুরিয়া আজ গাছ কাটতে পেরেছে পনেরটা। তারা উভয়ে অবাক হলো, কারণ সে আগের দিনের তুলনায় আজ আরও বেশি মেহনত করেছে।

তৃতীয় দিন হিসেব করে দেখা গেলো, গাছের সংখ্যা আরো কমে গেছে। সারাদিনে সাকুল্যে কাটা হয়েছে দশটা গাছ।

রাতে ঘুম হলো না, খাওয়া-দাওয়ায় মন বসলো না। কেন এমন হচ্ছে? সে তো চেষ্টায় কমতি করছে না।

মনিবকে বিষয়টা খুলে বললো। মনিব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন তোমাকে যে কুঠারটা দিয়েছিলাম সেটাতে আর ধার দিয়েছিলে?

- না ওস্তাদ, ধার তো দেই নি।

- সমস্যা তো এখানেই।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭

জেলের সুখ

পুরি সমুদ্র সৈকত। ভারত। একজন জেলে বসে আছে। গাছের ছায়ায়। হুক্কা পান করছে। এমন সময় অত্যন্ত বিত্তশালী মাছের পাইকার আসলো। জেলেকে প্রশ্ন করলো:

-মাছ না ধরে ছায়ায় বসে হুক্কা টানছো যে?

-আজকের মতো যথেষ্ট মাছ ধরা হয়ে গেছে।

পাইকার কিছুটা উত্তপ্ত স্বরেই পাল্টা প্রশ্ন করলো, তুমি তো আরো বেশি মাছ ধরার চেষ্টা করতে পারতে, তা না করে কেনো অলস সময় নষ্ট করছো?

- আরো বেশি মাছ ধরে কী হবে?
- সেগুলো বিক্রি করে, একদিন আরো বড় বোট কিনতে পারবে।
- আরো বড় বোট কিনে কী হবে?
- তাহলে আরো গভীর সমুদ্রে গিয়ে বড় বড় মাছ ধরতে পারবে।
- আরো বড় বড় মাছ ধরে কী হবে?
- আরো বেশি টাকা খরচ করে বাড়ি গাড়ি করতে পারবে।
- বাড়ি গাড়ি করে কী হবে?
- তাহলে এই যে আমার মতো সুখে থাকতে পারবে।
- আমাকে দেখে কি অসুখী মনে হচ্ছে?

জীবন জাগার গল্প: ৫৮

কাজের প্রতিদান

মনা মিস্ত্রির বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মতো হাত চলে না। বাঁটালি হাতে আগের সেই জোর পান না। তারপরও পেটের টানে কাজ করে যান। গত বছর মনিব হামিদ মিস্ত্রি মারা যাওয়ার পরই ভেবেছিলেন কাজ ছেড়ে দেবেন। কিন্তু মনিবের ছেলে হাতেপায়ে ধরে রেখে দিলো। সুরমা ফার্নিচারে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেলো। বিকেলে বাড়ি যাওয়ার সময় নতুন মনিবকে বললো:

বাজান! আর পারছি না, রথ-হাত আর চলে না। এবার বিদায় দাও।

ছোট মনিব বললো:

চাচাজান! ঠিক আছে, আপনার উপর আর জোর খাটাবো না। শেষবারের মতো একটা কাজ করে দিয়ে যান। আপনার বাড়ির পাশে আমাদের খালি যে জমিটা আছে, সেখানে একটা ঘর তুলে দিয়ে যান।

আচ্ছা বাজান, ঠিক আছে।

মনা মিস্ত্রি পরদিন থেকে কাজে নেমে পড়লো। দায়সারাভাবে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করলো। ছোট মনিবকে ঘরটা বুঝিয়ে দিলো। ছোট মনিব বললো:

চাচাজান আগামীকাল সকালে একটু বাড়িতে আসবেন, আম্মা আপনাকে একটা কথা বলবেন।

মনা মিঞা পরদিন মনিবের বাড়িতে হাজির হলো। পর্দার আড়াল থেকে হামিদ মিস্ত্রির বিধবা স্ত্রী বললো:

ছেলের বাপ মরার আগে আপনাকে এই বাক্সটা দিতে বলেছেন।

এই বাক্সে কী আছে?

এই বাক্সে আছে, আপনি যে ঘর বানিয়েছেন সেই ঘরের চাবি আর আপনার নামে জমির দলিল। বুড়া মনা মিস্ত্রির মনে তখন আনন্দের বদলে বেদনা। আহ্! আগে যদি ঘুর্ণাক্ষরেও টের পেতাম এই ঘর আমার তাহলে আরো কত যত্ন করেই না ঘরটা বানাতাম।

জীবন জাগার গল্প: ৫৯

ই-মেইল এড্রেস

বেকার যুবক। এ অফিস সে অফিস ঘুরে ঘুরে চাকরির সন্ধান করছে। এক অফিসের সামনে দেখলো:

'একজন অফিসবয় (পিয়ন) আবশ্যক'।

যুবকটি ভেতরে গিয়ে দেখলো আরো কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী সেখানে অপেক্ষা করছে।

সাক্ষাৎকার-পর্বটা যুবক বেশ ভালোভাবেই উতরে গেলো। তাকে একজন বললো:

তোমার ই-মেইল এড্রেসটা রেখে যাও। আমরা পরে যোগাযোগ করবো।

যুবক বললো: আমার ই-মেইল এড্রেস তো দূরের কথা, কম্পিউটারই নেই।

পরীক্ষক বললো: তোমার ই-মেইল এড্রেস নেই মানে তো তোমার অস্তিত্বই নেই। তোমাকে দিয়ে আমাদের হবে না।

যুবকটি হতাশ হয়ে বের হয়ে আসলো। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে পকেটে যা ছিলো তা দিয়ে একটা ঝুড়ি কিনলো। আর কিছু সবজি কিনে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করতে শুরু করে দিলো। দিন শেষে দেখা গেল, খরচাপাতি বাদ দিয়ে কিছু লাভও হয়েছে। উৎসাহ পেয়ে এভাবে চালিয়ে গেলো।

বছরখানেক পরে একটা ভ্যান কিনলো। আরো কিছুদিন পর একটা ভাঙাচোরা লরি কিনলো। এভাবে চলতে চলতে একসময় সে সবজি ব্যবসায় এক বিরাট মহাজনে পরিণত হলো।

এবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ব্যাংক একাউন্ট, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি খোলার কথা ভাবলো। প্রথমে একটা ফ্ল্যাট কিনবে বলে ঠিক করলো। তার কাছে একজন ফ্ল্যাট বিক্রির দালাল আসলো। কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর দালাল তাকে বললো:

আপনার ই-মেইল এড্রেসটা দিন। আমাদের বিভিন্ন সাইজের ফ্ল্যাটগুলোর কিছু ছবি ই-মেইল করে দিবো। আপনি দেখেশুনে পছন্দ করে সরাসরি দেখতে যেতে পারবেন।

আমার কোন ই-মেইল এড্রেস নেই।

দালাল এ-কথা শুনে তো মহা অবাক। বলেন কি? এতবড় ব্যবসা আপনার! আপনার কোনও ই-মেইল এড্রেস নেই? জানেন, আপনার একটা ই-মেইল এড্রেসই আপনাকে কী থেকে কী বানিয়ে দিতে পারতো?

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন:

ই-মেইল এড্রেস আমাকে একজন অফিস বয় ছাড়া আর কিছুই বানাতে পারতো না।

জীবন জাগার গল্প: ৮০

উল্টো দিক

শুক্রবার। ছুটির দিন। সকালে উঠেই পিতা বাগানে বসে দৈনিকে চোখ বুলাচ্ছেন। পাশাপাশি চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। ছোট মেয়েটা ভারি দুষ্টু। দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না। একবার চুল টানছে, একবার নাক ধরে টানছে, একবার পত্রিকার পাতা টেনে ছিঁড়ে ফেলছে, চশমা টেনে খুলে ফেলছে। কাঁধে চড়ে বসছে। ঘোড়ায় চড়ার জন্য বায়না ধরছে। বাবা মেয়ের জ্বালাতনে আর থাকতে না পেরে কিছুক্ষণ শান্তিতে পত্রিকা পড়ার জন্য একটা উপায় খুঁজলেন। সেদিনের পত্রিকায় একটা মানচিত্র ছিলো। পিতা মানচিত্রটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। টুকরোগুলো মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন:

যাও তো সোনামণি! মানচিত্রটা জোড়া লাগিয়ে নিয়ে এসো। বাবা এবার নড়েচড়ে জুত করে বসলেন। ভাবলেন আজকের পত্রিকাটা আয়েশ করেই পড়া যাবে। মেয়ে আজ সারাদিনেও মানচিত্র জোড়া লাগাতে পারবে না।

মেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেলো। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই মেয়ে মানচিত্র জোড়া লাগিয়ে হাজির। বাবার চক্ষু চড়কগাছ। কী দস্যি মেয়ে রে বাপু!

তা মামণি! এত তাড়াতাড়ি কিভাবে মানচিত্রটা জোড়া লাগিয়ে ফেললে?

মেয়ে উত্তর দিলো:

মানচিত্র কোথায়, আমি তো একটা মানুষ জোড়া লাগিয়েছি। ওটা জোড়া লাগানোর পর দেখি অপর পাশে একটা মানচিত্রও জোড়া লেগে গেছে।

জীবন জাগার গল্প: ৬৯

মেয়েটির ফোন নাম্বার

রাস্তা দিয়ে এক মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পাড়ার গলির মুখে একদল ছেলে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের একজন বাজি ধরে বললো:

আমি যদি তোদেরকে মেয়েটির ফোন নাম্বার এনে দিতে পারি, তাহলে আমাকে কী দিবি?

এক হাজার টাকা দেবো।

ঠিক আছে।

ছেলেটি এগিয়ে গেলো। মেয়েটাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি আপনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি?

মেয়েটি বিব্রতবোধ করলো। একটু চুপ থেকে উত্তর দিলো:

১৮-২৪-৩০

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, এটা কোন অপারেটর?

মেয়েটি বললো:

এটা সরাসরি আল্লাহর আরশের এক্সচেঞ্জের নাম্বার। আঠারতম পারা, চব্বিশ নাম্বার সূরা, ত্রিশ নাম্বার আয়াত। বাড়ি গিয়ে ডায়াল করবেন।

ছেলেটি বাড়ি গিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বারে ডায়াল করে দেখলো:

আপনি মুমিনগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিসমূহ অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে, এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র, নিশ্চয় আল্লাহ যা তোমরা কর সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত (সূরা মুমিন)।

জীবন জাগার গল্প: ৬২

মায়ের ভালোবাসা

অসহায় মা তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে বাস করে। ছেলে বুঝ হওয়া অবধি দেখে আসছে তার মায়ের একটা চোখ নেই। এজন্য মাকে দেখতে কুৎসিত দেখায়। এ নিয়ে ইশকুলে তার বন্ধুরা হাসাহাসি করে। একদিন মা স্কুলের পাশ দিয়ে কোথাও যাওয়ার সময়, ছেলেকে দেখতে স্কুলে গেলেন। ছেলে লজ্জায় দেখা করতে আসলো না। মা কিছু না বলে ফিরে আসলেন।

ছেলে একসময় বড় হলো। পড়ালেখা শেষ করে চাকুরি নিলো। বিয়ে-শাদি করে আলাদা হয়ে গেলো। মায়ের সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখলো না। খোঁজখবরও নিলো না।

অনেক দিন পর ছেলে তার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের পূর্ণমিলন-সভার দাওয়াত পেয়ে আসলো। কী মনে করে সে আগের পাড়া দেখতে এলো। এই ফাঁকে মা কেমন আছে সেটাও দেখা হয়ে যাবে। যে ভাড়াবাড়িতে মা থাকতেন সেখানে এসে দেখলো, এখন সেই বাড়িতে অন্য ভাড়াটিয়া থাকে।

পাশের বাড়ির মায়ের বয়েসি এক মহিলা ছেলেটিকে দেখে বের হলেন। ছেলেটিকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন:

এটা তোমার আম্মু মারা যাওয়ার আগে তোমাকে দিতে বলে গেছেন।

ছেলে চিঠিটা খুলে পড়লো। তাতে লেখা আছে:

বাবা! আমি জানি আমার একটা চোখ না থাকাতে আমাকে ভারি কুৎসিত দেখাতো। সেজন্য অন্যদের মতো তুমিও আমাকে পছন্দ করতে না। আমার চোখ না থাকার কারণটা জানলে নিশ্চয় তুমি আর আমাকে ঘৃণা করতে পারতে না।

তুমি তখন একদম ছোট। তোমার আব্বু, আমি আর তুমি অন্য একটা শহরে থাকতাম। একদিন এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তোমার আব্বু মারা যান। আমিও গুরুতর আহত হই। আর তোমার একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তখন আমার একটি চোখ তোমাকে দিয়ে দিই। এরপর আমরা এই শহরে চলে আসি। এই ঘটনা আর কেউ জানে না, আমি আর কাউকে বলি নি।

জীবন জাগার গল্প: ৬১

আল্লাহর কুদরত

জাহাজডুবিতে সবকিছু হারিয়ে এক লোক এক দ্বীপে আশ্রয় নিলো। জনমানবশূন্য-সুনসান দ্বীপ। প্রথম কিছুদিন লোকটা এমনি এমনি ঘুরেফিরে কাটালো। এটা সেটা, ফলমূল খেয়ে কাটালো। সারাদিন সাগর তীরে এসে বসে থাকলো কোনও জাহাজ আসে কিনা, এই আশায়। আল্লাহর কাছে অনেক দু'আ করলো। কিন্তু কোনও জাহাজ এদিকে আসলো না।

এভাবে দীর্ঘদিন কেটে গেলো। লোকটা এতদিনে কিছুটা গুছিয়ে বসেছে। ছোটখাট একটা কুটিরও বানিয়েছে। কুটিরের চারপাশে কিছু ক্ষেতিশস্যও করেছে।

একদিন লোকটা বনে শিকারে গেলো। শিকার থেকে এসে দেখে চুলার আগুনে বাতাসের ঝাপটা লেগে, ঘরের চালে আগুন ধরে গেছে। এতদিনের যা কিছু সঞ্চয় ছিলো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

লোকটা হতাশায় মুষড়ে পড়লো। চিৎকার করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো:

ইয়া আল্লাহ! এত দু'আ করলাম। একটা জাহাজ পাঠাতে, তা না করে সহায় সম্বল যা ছিলো তাও পুড়িয়ে দিলে?

হাঁটুতে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে লোকটা একসময় দেখলো, একটি জাহাজ আস্তে আস্তে তীরের দিকে আসছে। জাহাজ এসে লোকটাকে উদ্ধার করলো। জাহাজে উঠে লোকটা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলো:

আপনারা কেনো এই দ্বীপে এলেন?

ক্যাপ্টেন বললো:

আমরা অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন বললো, দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ওখানে কোনও দ্বীপে আটকে-পড়া মানুষ আছে। এরপর আমরা জাহাজ নিয়ে ছুটে এলাম।

জীবন জাগার গল্প: ৮৪

ভালোবাসা ও বিয়ে

মনোবিজ্ঞানের ক্লাস। অধ্যাপক ক্লাশে আসার পর একজন প্রশ্ন করলো:

স্যার ভালোবাসা বিষয়টা কী?

অধ্যাপক বললেন:

উত্তর দেয়ার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি ধানক্ষেতে যাও। পুরো ক্ষেতের সবচেয়ে উঁচু ও বড় গোছাটা নিয়ে এসো। শর্ত হলো:

ক্ষেতের যেখান দিয়ে একবার যাবে সেখানে আবার ফিরে আসতে পারবে না।

ছাত্রটি ক্ষেতে গেলো। প্রথমে গিয়ে দেখলো বড়সড় একটি গোছা বাতাসে দুলছে। কিন্তু তার ভাবনায় এলো, সামনে হয়তো আরো বড় গোছা থাকতে পারে। আরেকটু এগিয়ে আরো বড় একটি গোছা দেখলো। কিন্তু মনে মনে ভাবলো আরেকটু এগিয়ে গেলে বোধ হয় আরো বড় গোছা পাবো।

এভাবে ক্ষেতের প্রায় মাঝামাঝি এসে অনুভব করলো, আর বড় কোনও গোছা দেখা যাচ্ছে না। বড় গোছাগুলো সব পেছনেই ফেলে এসেছে। কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। খালি হাতেই ক্লাসে ফিরে আসলো।

অধ্যাপক বললেন:

ভালোবাসা এমনিই। সবসময় তুমি আরো ভালো বা সুন্দর কারোর খোঁজে থাকো, পরে এক সময় দেখা যায় তোমার উপযুক্ত মানুষ তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

এবার ছাত্রটি প্রশ্ন করলো:

স্যার, তাহলে বিবাহ বিষয়টা কী?

তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে তোমাকে এবার গম ক্ষেতে যেতে হবে। ক্ষেতে গিয়ে পুরো ক্ষেতের সবচেয়ে উঁচু ও বড় গোছাটা নিয়ে আসবে। শর্ত হলো:

ক্ষেতের যেখান দিয়ে একবার যাবে পেছন ফিরে আসতে পারবে না।

ছাত্রটি ক্ষেতে গেলো। এবার সতর্ক থাকলো। আগের বারের ভুল যাতে আর না হয়। ক্ষেতের মাঝামাঝিতে গিয়ে একটা গোছা – বেশিকিছু না ভেবেই – তুলে নিলো। এবার সন্তুষ্টচিত্তে ক্লাসে ফিরে এলো।

শিক্ষক বললেন:

এবার তুমি – আরো বেশি ভালোর জন্য – বেশি খোঁজাখুঁজি না করে, মোটামুটি ভালো লেগেছে এমন একটা গোছা তুলে এনেছো এবং ভেবেছো এটাই সবচেয়ে ভালো গোছা, এবং সন্তুষ্ট মনেই ফিরে এসেছো। এটাই হলো বিয়ে।

জীবন জাগার গল্প: ৬৮

পনিরের মাপ

ইদন মিঞার সংসারে এখনো সন্তান আসে নি। স্ত্রী আর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তিনজনের সংসার। পারিবারিক পেশা পনির বিক্রি করে দু'চার পয়সা যা আসে, তা দিয়েই কোনও রকমে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। দিনরাত চেষ্টাচরিত্র করে যা পনির তৈরি হয়, একটা দোকানে দিয়ে আসে। বিনিময়ে সে দোকান থেকে পনির বানানোর জন্য দুধ-চিনি নিয়ে আসে।

এভাবেই চলছিলো। একদিন দোকানদার পনির মেপে দেখে পনির এক কেজির জায়গায় আছে নয়শ' গ্রাম।

পরদিন পনিরওয়ালা আসলে দোকানদার রেগেমেগে বললো:
আমি তোমার কাছ থেকে আর পনির কিনব না।

কেনো, সওদাগর সাব?

তুমি আমাকে এতদিন মাপে কম দিয়ে আসছ। প্রতি কেজিতে একশ গ্রাম কম দিয়েছো।

সওদাগর সাব! আমাদের বাড়িতে তো মাপার জন্য কোনও দাঁড়িপাল্লা নেই। আপনার দোকান থেকে প্রতিদিন যে এক কেজি চিনি নিতাম, ওই চিনি দিয়েই আমার গিন্নি পনির মাপতো।

জীবন জাগার গল্প: ৬৯

যুবকের বালখিল্যতা

দ্রুতবেগে ট্রেন চলছে। বৃদ্ধ পিতা নিজ আসনে বসে আছেন। জানালার পাশে বসেছে বৃদ্ধের সন্তান। বয়স আনুমানিক পঁচিশ বছর। ছেলেটা সারাক্ষণই ছটফট করছিল। জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে, আবার পিতাকে ডেকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করছে।

বাবা বাবা! দেখো রাস্তার পাশের গাছগুলো পেছন দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ পিতা হেসে ছেলেকে কথায় সায় দিলেন।

বাবা দেখো দেখো! ওই পুকুরটাতে কী সুন্দর ফুল ফুটে আছে? আকাশের মেঘগুলো আমাদের ট্রেনের সাথেই দৌড়াচ্ছে।

বাবা-ছেলের উল্টো পাশের আসনে বসা ছিলো এক নবদম্পতি। তারা এতবড় ছেলের এমন শিশুসুলভ আচরণে অবাক হচ্ছিলো। কিছুটা বিরক্তবোধও করছিলো।

শেষে আর থাকতে না পেরে স্বামীটি বৃদ্ধ পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো:

ছেলেকে কোনও মানসিক ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেনো?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন:

ডাক্তার তো দেখিয়েছি, এক সপ্তাহ আগে ওর চোখের অপারেশন হয়েছে। আজ হাসপাতাল থেকেই আসছি। ছেলে এতদিন চোখে দেখতে পেত না। আজকেই ওর চোখের ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে।

জীবন জাগার গল্প: ৮৭

বোতলের মোরগ

তিউনিসিয়া। রাজধানীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আরবি ব্যাকরণের ক্লাস। বার্ষিক পরীক্ষার আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন। সাথে দু'জন লোক। শিক্ষাবোর্ড থেকে পাঠানো পর্যবেক্ষক।

আজ চলছিল তানাযু'-এর আলোচনা। আরবি ব্যাকরণের একটি জটিল বিষয়। ক্লাশ চলার এক পর্যায়ে এক দুষ্ট ছেলে আপন মনে বলে উঠলো:

আরবি ভাষা কী কঠিন রে বাবা! এর চেয়ে ফরাসি ভাষা অনেক সহজ। ওর কথা শুনে আরো অনেক ছাত্রই বলে উঠলো – হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরবি ভাষা খুবই কঠিন। সবাই একজোট হয়ে গেলো।

শিক্ষক চুপ করে ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া দেখলেন। তারপর বললেন:

ঠিক আছে, আজ আর পড়া হবে না। আজ আমরা খেলবো। ছাত্ররা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। দুই পরিদর্শকের মুখ ব্যাজার হয়ে গেলো।

শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে একটা বোতল আঁকলেন। বোতলের ভিতরে একটি মোরগ আঁকলেন। এরপর বললেন:

বোতলটা না ভেঙে কে এই মোরগটাকে বের করতে পারবে? মোরগটাকে জীবিত থাকতে হবে।

ছাত্ররা সবাই গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। দেখা গেলো দুই পরিদর্শকও নড়েচড়ে বসলেন। ভ্রূ কুঁচকে ভাবনায় ডুবে গেলেন। কিন্তু কেউ সমাধান বের করতে পারলো না। সবাই ব্যর্থ হলো।

একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে বলেই ফেললো:

উস্তাদজি! বোতল না ভেঙে এই মোরগ বের করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি বরং যে এই মোরগটাকে বোতলের মধ্যে রেখেছে তাকেই বলুন বের করতে।

ছাত্ররা এ কথা শুনে হেসে দিলো। শিক্ষকের কথা শুনে ছাত্রদের হাসি থেমে গেলো। শিক্ষক বললেন:

একদম ঠিক বলেছো। এটাই সঠিক জবাব। যে মোরগটাকে বোতলে রেখেছে সেই বের করতে পারবে। তদ্রূপ তোমরাও তোমাদের মাথায় একটা কথা ঢুকিয়ে বসে আছো: 'আরবি ভাষা কঠিন'। এখন আমি যতই ব্যাখ্যা করি, বিশ্লেষণ করি, সহজ করে বোঝাই, কিছুতেই সফল হবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই নিজেদের মাথা থেকে এই বদ্ধমূল ধারণাটা বের করছো।

দেখো! আমরা এমন আরো কতো মোরগ মাথায় ঢুকিয়ে বসে আছি। সেগুলোকে আমাদেরকেই বের করতে হবে।

আরেকটা কথা মনে রাখবে, সহজ বা কঠিন বলে কোনও কিছু নেই। আমাদের চিন্তাই সবকিছুকে সহজ-কঠিন করে তোলে।

জীবন জাগার গল্প: ৬৮

ইসলামের সৌন্দর্য

প্যারিসের এক মসজিদ। ইমাম সাহেব তখন তা'লীম করছিলেন। একটি ছোট ছেলে এসে বললো:

আম্মু আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাদের ইশকুলে লেখাপড়া করার জন্য।

ইমাম সাহেব বললেন:

খোকা, তোমার আম্মু কোথায়? তোমার সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক কিছু তথ্য জানা দরকার।

শিশুটি বললো:

আম্মু তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মসজিদে আসতে চাচ্ছেন না। তিনি মুসলিম নন। আর তার পোশাকাদিও ঠিক নেই।

ইমাম সাহেব দ্রুত মসজিদের বাইরে গেলেন। ছেলেটির মাকে জিজ্ঞেস করলেন:

আপনি একজন অমুসলিম হয়ে কেনো ছেলেকে ইসলাম শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন?

ছেলেটির মা বললো:

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক মুসলিম পরিবার থাকে। ওই পরিবারের ছেলেরা স্কুলে যাওয়ার আগে দেখি মায়ের হাতে চুমু খায়। আবার স্কুল থেকে ফিরে এসেও তাই করে। এই পরিবারকে আমি সবসময় সুখী দেখি। আর কোনও মুসলিম পরিবারকে দেখি নি যারা তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে।

ছেলেটির মা আরো বললো:

জনাব! আমার ছেলেকেও এমন শিক্ষা দিন, যাতে সে আমার সাথে ওই মুসলিম ছেলেগুলোর মতো আচরণ করে।

জীবন জাগার গল্প: ৮৯

ভালোবাসার পাত্র

এক বুযুর্গ কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দেখলেন এক যুবক সদ্য খোঁড়া একটা কবরের পাশে বসে হাউমাউ করে কাঁদছে।

বুযুর্গ যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন:

- তুমি কাঁদছো কেনো?

- আমি যাকে ভালোবাসতাম সে মারা গিয়েছে। আমাকে একা ছেড়ে চলে গেছে।

বুযুর্গ বললেন:

তুমি ভালোবেসেছ এমন একজনকে, যে মারা যায়। যদি চিরঞ্জীব সত্তা আল্লাহকে ভালোবাসতে তাহলে তিনি তোমাকে কখনো ছেড়ে যেতেন না।

জীবন জাগার গল্প: ৭০

চিকিৎসা বিল

হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ। নব্বই বছরের এক বৃদ্ধ রোগীর চোখের ছানিপড়ার অপারেশন হলো। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে আরো কিছু ওষুধ আর ইঞ্জেকশনের কথা লিখে দিলেন। সাথে তার হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্রও দিয়ে দিলেন।

ডাক্তার নার্সকে বিলের কাগজ আনতে বললেন। বিলের কাগজটা দেখে বৃদ্ধ কেঁদে দিলেন।

ডাক্তার বললেন:

বিলের পরিমাণ যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তাহলে আমরা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করবো।

বৃদ্ধ বললেন:

না না, আমি বিলের পরিমাণ দেখে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, মহান আল্লাহ তা'আলা নব্বই বছর পর্যন্ত আমাকে এমনি এমনিই চোখের নি'আমতে ভূষিত করে রেখেছেন। কিন্তু একবারো এজন্য কোনও বিল পাঠালেন না। তিনি কতইনা মহৎ আর মহান।

জীবন জাগার গল্প: ৭১

বিবেকের প্রশ্ন

আর্থার এ্যাশ। কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড়। তিন তিন গ্র্যান্ডস্লাম বিজয়ী। তিনি দুরারোগ্য এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। ওপেন হার্ট সার্জারি হলো। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে সারাবিশ্ব থেকে তার ভক্তরা অজস্র চিঠি পাঠালো। এক চিঠিতে একজন ভক্ত তাকে প্রশ্ন করলো:

এই অভিশপ্ত রোগের জন্য ঈশ্বর আপনাকেই কেন বেছে নিলেন?

আর্থার এ্যাশ উত্তর দিলেন:

সারাবিশ্বে প্রায় পাঁচশ মিলিয়ন শিশু টেনিস খেলা শুরু করেছিলো।

তাদের মধ্যে পঞ্চাশ মিলিয়ন টেনিস খেলার কায়দা-কানুন শিখেছে।

এদের থেকে পাঁচ মিলিয়ন শিশু পরবর্তীতে টেনিস খেলা চালিয়ে গেছে।

এদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ হাজার পেশাদার খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে।

এদের থেকে পাঁচ হাজার ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত গ্রান্ডস্লামের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করেছে।

এদের থেকে পঞ্চাশ জন ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত উইম্বলডনে অংশ নিয়েছে।

এদের মধ্য থেকে চারজন সেমি ফাইনালে পৌঁছেছে।

এদের মধ্য থেকে দুইজন ফাইনালে পৌঁছেছে।

সবার শেষে থেকেছে একজন। চূড়ান্ত বিজয়ী।

আর আমিই সেই চূড়ান্ত বিজয়ী। আমি যখন চ্যাম্পিয়নশিপের কাপ উঁচিয়ে ধরেছিলাম তখন তো ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করি নি আমিই কেনো বিজয়ী? অন্যরা নয় কেনো?

এখন রোগাক্রান্ত হয়ে কেন ঈশ্বরের কাছে জানতে চাইবো, তিনি আমাকেই কেনো রোগের জন্য বেছে নিলেন?

জীবন জাগার গল্প: ৭২

বাড়ি বিক্রি

এক লোক ঠিক করলো তার বর্তমান বাড়ি বিক্রি করে দেবে। নতুন আরো ভালো বাড়িতে উঠবে। এ ব্যাপারে তার এক অভিজ্ঞ বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করলো। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে তার সাহায্য চাইলো। বন্ধুটি বাড়ি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জেনে নিলো। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য একটা বিজ্ঞপ্তি তৈরি করলো। বিজ্ঞপ্তিতে লিখলো:

বাড়িটি শহরের মনোরম স্থানে অবস্থিত। বাড়িটি বৃহৎ পরিসর জুড়ে নির্মিত। বাড়িটির অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর কথা লিখলো। বাড়ির সামনের অনুপম বাগানটির কথাও থাকলো। বাড়ির পেছনের সুইমিং পুলের কথাও বাদ গেলো না।

আর কিছু বাদ পড়ে গেলো কিনা যাচাই করার জন্য বন্ধুকে শেষবারের মতো বিজ্ঞপ্তিটা দেখালো।

লেখাটা পড়ে বাড়ির মালিক বন্ধুর দু'চোখ কপালে উঠলো। আমার বাড়িতে এতোকিছু আছে? কই আমি এতকিছু তো এতদিন খেয়াল করি নি?

থাক বন্ধু, পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তি দেয়ার দরকার নেই। আমি বাড়ি বিক্রি করবো না।

জীবন জাগার গল্প: ৭৩

রাজার স্বপ্ন

এক রাজা স্বপ্নে দেখলেন: তাঁর সব দাঁত পড়ে গেছে। একজন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারকে ডেকে আনা হলো। ব্যাখ্যাকার এসে রাজাকে বললো, আপনি সত্যি সত্যিই এই স্বপ্ন দেখেছেন জাঁহাপনা?

হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি।

ইশ! সব্বোনাশ, জাঁহাপনা! আপনার সামনেই একে একে আপনার সমস্ত আত্মীয় স্বজন মারা যাবে।

এই ব্যাখ্যা শুনে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যাখ্যাকারীর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য জল্লাদকে হুকুম দিলেন। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনেরও একই অবস্থা হলো।

এবার আরেক দেশ থেকে নতুন একজন ব্যাখ্যাকার ডেকে পাঠানো হলো। কাঁপতে কাঁপতে বেচারা দরবারে হাজির হয়ে কুর্নিশ করলো।

রাজা স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। ভিনদেশি ব্যখ্যাকার খুশিতে ডগমগ হয়ে উৎফুল্ল স্বরে বললো:

মহারাজ! আপনি নিশ্চিত যে আপনিই এই স্বপ্ন দেখেছেন?

রাজা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আলবত আমি দেখেছি।

ব্যাখ্যাকার বললো:

এই স্বপ্নের ব্যখ্যা তো চমৎকার! আপনিই হতে যাচ্ছেন আপনার পরিবারের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ।

ব্যাখ্যা শুনে রাজার দিল বেশ খোশ হলো। অনেক ইন'আম দিয়ে ব্যাখ্যাকারকে বিদায় দিলেন।

জীবন জাগার গল্প: ৭৪

যমজ ভাই

অনেকদিন সন্তানাদি না থাকার পর, আল্লাহ তা'আলা এবার ঘর আলো করে সন্তান দিলেন। একেবারে যমজ সন্তান দান করলেন। মা-বাবা মহাখুশি। আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

দুই ছেলে শৈশব পার হয়ে কৈশোরে পা দেয়ার সময় থেকেই একটা বিষয় নিয়ে মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সাধারণত জমজ ভাইবোনেরা সবকিছুতে এক রকম হয়। চেহারা-সূরত, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদিতে।

কিন্তু এই দুই ভাইয়ের চেহারা-সূরত এক হলেও স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। ভিন্ন রকমের। একজনের সবটাতেই আনন্দ আর সৌন্দর্য, আরেক জনের সবকিছুতেই বেদনা আর বিমর্ষতা। একজন সবসময় ভালো কিছুর চিন্তা করে। আরেকজন সবসময় খারাপ কিছুর চিন্তা করে।

দুই ভাইকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার দুজনের মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করার জন্য মা-বাবাকে বললেন:

আগামী ঈদে দুঃখী ছেলেটাকে সাধ্যানুযায়ী ভালো উপহার দেবেন। আর সুখী ছেলেটাকে ঘাসভর্তি একটা বাক্স দিবেন। রাতে দুই ভাইকে আলাদা আলাদা দুই কামরায় ঘুমুতে দেবেন। সকালে উপহার খোলার সময় যেন দু'জন একা থাকে। এরপর দু'জনের প্রতিক্রিয়া আমাকে জানাবেন।

বাবা-মা ডাক্তারের পরামর্শ মতো কাজ করলেন। ছেলেদের অগোচরে দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ রাখলেন।

দুঃখী ছেলেটা উপহার খুলেই বলে উঠলো:

এ্যাহ! এটা আবার কী ধরনের উপহার? এটা কোনও উপহার হলো? ল্যাপটপটার রং সুন্দর না। আর আমি নিশ্চিত, ল্যাপটপটা কিছুদিন গেলেই ভেঙে যাবে। আমার এক বন্ধুর কাছে অনেক বড় একটা খেলনা গাড়ি আছে। ল্যাপটপের চেয়েও ওটা অনেক বেশি সুন্দর।

বাবা-মা এবার আরেক ছেলের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন:

এই ছেলে বাক্সের ঘাসগুলো একটা একটা করে ওড়াচ্ছে আর হাসতে হাসতে বলছে:

এই ঘাস দেখেই আমি বুঝে গেছি, কোথাও একটা ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়াটা আমার জন্যই কেনা হয়েছে। এখন ঘোড়াটা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে।

জীবন জাগার গল্প: ৭৮

দৃষ্টির স্বচ্ছতা

পুরো শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই মন্দা দেখা দিলো। শহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। বাজার কমিটি বৈঠকে বসলো। সভা শেষে সিদ্ধান্ত হলো:

একজন বক্তাকে দাওয়াত দিয়ে আনা হবে। যার বক্তব্য শুনে সবাই হারানো উৎসাহ-উদ্যম ফিরে পাবে। তাই করা হলো।

বক্তা মঞ্চে উঠলেন। হাতে একটা শাদা কাগজ আর একটা লাল কলম।

সবার সাথে পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর বক্তা শাদা কাগজটিতে একটা গাঢ় বিন্দু আঁকলেন। কলমটা পকেটে পুরে শাদা কাগজটা ব্যবসায়ীদের দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। প্রশ্ন করলেন:

আপনারা কী দেখতে পাচ্ছেন?

একজন উত্তর দিলো:

একটা লাল বিন্দু।

বক্তা আবার জানতে চাইলেন:

আর কী দেখতে পাচ্ছেন?

এবার আরো অনেকে উত্তর দিলো:

আমরা একটা লাল বিন্দু দেখতে পাচ্ছি।

বক্তা আবার প্রশ্ন করলেন:

আপনারা কি লাল বিন্দু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

না, আমরা আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বক্তা বললেন:

আমার হাতে শাদা কাগজটা কি আপনাদের চোখে পড়েনি? এতো বড়ো একটা বস্তু আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো?

বক্তা বললেন:

দেখুন, বাস্তব জীবনেও এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা খুব সুন্দর, আনন্দদায়ক ও রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, ঠিক এই শাদা কাগজের মতো।

আবার এমন অনেক ভুল আর ব্যর্থতা আসে যা, আমাদের চলার পথকে থমকে দেয়, ঠিক এই লাল বিন্দুটার মতো। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আপাত গুরুত্বহীন ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি।

আমরা দৃষ্টিকে বিন্দুর মধ্যে আটকে না রেখে আরেকটু প্রসারিত করলেই বিন্দুটাকে খুব ছোট আর ক্ষুদ্র মনে হবে, যা সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা আশেপাশে তাকালেই আরো বৃহত্তর জীবনের ছবি সামনে ফুটে উঠবে। সামান্য একটা সমস্যা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না।

জীবন জাগার গল্প: ৭৮

ছাগলের মা

এক বুড়ি রাস্তা দিয়ে চারটা ছাগল ছানা নিয়ে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে দুজন যুবক হেঁটে যাচ্ছিলো। যুবকদু'টি দুষ্টুমি করে বললো:

সুপ্রভাত ছাগলের মা!

বুড়ি উত্তর দিলেন:-

বেঁচে থাকো, বাছারা আমার।

জীবন জাগার গল্প: ৭৭

টকমিষ্টি ফল

ফলবিক্রেতা। সুন্দর করে পশরা সাজিয়ে বসে আছে। এক বৃদ্ধা এসে জিজ্ঞাসা করলো:

কমলালেবুগুলো কি টক হবে?

ফলবিক্রেতা ভাবলো:

বুড়ি বোধ হয় টক হলে ফল কিনবে না। তাই সে বললো:

না না, কমলাগুলো এক্কেরে চিনির মতো মিষ্টি। কতগুলো দিবো?

বুড়ি বললো, আমার ছেলের ঘরে নাতি হবে। বউ টক কমলালেবু খেতে চেয়েছে।

কিছুক্ষণ পর এক সন্তানসম্ভবা মহিলা তার স্বামীর সাথে এলো। স্বামী প্রশ্ন করলেন, কমলাগুলো কি টক?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো বিশেষ প্রজাতির টক কমলা। বাজারে শুধু আমার কাছেই আছে। কয় ডজন দেবো?

স্বামী লোকটা বললেন:

না না, টক কমলা আমার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে আমার বৃদ্ধা আম্মা আছেন। তিনি মিষ্টি কমলা পছন্দ করেন।

জীবন জাগার গল্প: ৭৮

সুন্দর ব্যবহার

ফুটপাতে এক ভিক্ষুক বসে আছে। এক যুবক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। ভিক্ষুকটির দুরবস্থা দেখে যুবকটির মনে দয়া হলো। পিছিয়ে এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, মানিব্যাগ ফেলে এসেছে। ভিক্ষুককে বললো:

বাবা! এখন দেয়ার মতো আমার পকেটে কিছু নেই। বিকেলে যাওয়ার সময় কিছু দিয়ে যাবো। ইনশাআল্লাহ।

ভিক্ষুক বললো:

বাজান, তুমি আমাকে যা দিলে আর কেউ তা দেয় নি।

- আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি?

- তুমি কিছু না দিতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছো, আমাকে 'বাবা' ডেকে সম্মান দেখিয়েছো। এমনটা তো সচরাচর কেউ করে না।

জীবন জাগার গল্প: ৭৯

জীবনপাতা

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছোট বোন, তার শিয়রে বসে আছে বড় বোন। ছোট বোন জানালা দিয়ে একটা গাছের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে।

আপু! গাছটিতে আর কয়টা পাতা ঝরে পড়ার বাকি আছে?

কেনো জিজ্ঞাসা করছো?

আমি স্বপ্নে দেখেছি, যেদিন এই গাছের শেষ পাতাটা ঝরে পড়বে সেদিন আমি মারা যাবো।

বড় বোন বললো:

তাহলে এসো, বাকি দিনগুলো আমরা হাসি-আনন্দে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি।

এরপর দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো। পাতাগুলোও একে একে ঝরে পড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র পাতা বাকি থাকলো। অসুস্থ বোনটি

সেই পাতার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগলো। বড় বোন তাকে হাসি আর আনন্দে রাখার চেষ্টায় কোনও কমতি করলো না।

এভাবে শরৎকাল গেলো, হেমন্ত গিয়ে শীতকালও পার হওয়ার পথে। আস্তে আস্তে বছরও পার হয়ে গেলো। পাতাটি আর ঝরলো না।

ছোট বোন আস্তে আস্তে সুস্থ হতে শুরু করলো। গাছে আবার পাতা গজালো। একসময় অসুস্থ বোন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো।

একদিন ছোট বোন পাতাটা পরীক্ষা করার জন্য গাছে চড়লো। অবাক হয়ে দেখলো:

গাছে ঝুলে থাকা পাতাটা নকল– নেহাত প্লাস্টিকের। বড় বোন তার অগোচরে সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছে।

জীবন জাগার গল্প: ৮০

মায়ের বনবাস

ছেলে বিয়ে করেছে। সংসারে বৃদ্ধা মা আর নববধূ। কিছুদিন বাদে, পুত্রবধূ শাশুড়িকে তার সংসারে রাখতে চাইলো না। বউয়ের প্ররোচনায় ছেলে মাকে বনে ফেলে আসবে বলে সম্মত হলো।

এক সকালে সে মাকে নিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিলো। পথে পড়লো গহীন বন।

মা যেতে যেতে রাস্তার দু'পাশে গাছের ডাল কেটে কেটে ফেলে রাখছিলো। এতে ছেলের পথচলার গতিতে বাধা পড়লেও কিছু বললো না। শেষ সময়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করতে চাইলো না, হয়তো বা।

মাকে গহীন বনের মাঝে রেখে, ছেলে ফিরতি পথ ধরলো। মা পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন গহীন বনে ছেলে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মা জোরে ডাক দিয়ে বললেন:

বাবা! আমি জানতাম তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে, তাই আসার সময় পথে পথে গাছের ডাল কেটে কেটে রেখে এসেছি। তুমি ওগুলো দেখে ঠিক ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবে।

জীবন জাগার গল্প: ৮১

আস্থা যাচাই

মেসে থাকা এক যুবক বাড়িওয়ালার ফ্ল্যাটে গেলো। চাচাজান একটা ফোন করা যাবে?

জি, আসো।

হ্যালো! ম্যাডাম, আপনাদের বাড়ির বাগানে মালীর প্রয়োজন আছে?

না নেই। আমাদের একজন মালী আছে।

আমি অর্ধেক বেতনে কাজটা করে দেবো।

না না, আমরা বর্তমান মালীর কাজে সন্তুষ্ট, তাকে বদলাতে চাই না।

যুবকটি আরো পীড়াপীড়ি করে বললো:

আমি বাগানের পাশাপাশি বাড়ির অন্য কাজও করে দেবো। গেইটে দারোয়ানের দায়িত্বও পালন করতে পারবো। বাগানটাকে শহরের সেরা বাগান বানিয়ে দেবো।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ম্যাডাম এবারো নেতিবাচক উত্তর দিলেন।

যুবকটি হেসে ফোনটা রেখে দিলো।

বাড়িওয়ালা এতক্ষণ ফোনালাপ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন:

আমি তোমার ইচ্ছাশক্তি দেখে এবং এতকিছুর পরও তোমাকে হাসতে দেখে চমৎকৃত। আমি তোমাকে আমাদের বাগানেই কাজে নিয়ে নেবো। তুমি চিন্তা করো না।

যুবকটি বললো:

আপনার প্রস্তাবের জন্য শুকরিয়া! আমি এতক্ষণ আমার মনিবের সাথেই কথা বলছিলাম।

জীবন জাগার গল্প: ৮২

পুতুলশিক্ষা

শিশু-সন্তান রেখে রানি মারা গেলেন। যুবরাজ বেড়ে উঠলো প্রধান উজিরের স্ত্রীর কোলে। যুবরাজ হিশেবে অভিষেকের দিন সবাই অনেক দামি

দামি পুরস্কার দিলো। প্রধান উজির সবার শেষে এসে যুবরাজকে তিনটি মাটির পুতুল উপহার দিলেন।

যুবরাজ মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন। থাকতে না পেরে মুখ ফুটে বলেই ফেললেন:

আমি কি ছোট মেয়ে যে পুতুল খেলবো?

না না, যুবরাজ! আমি এই পুতুল দিয়েছি আমাদের ভবিষ্যৎ-রাজাকে। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, পুতুলগুলোর কানে ছিদ্র করা আছে। এই নিন সুতো। সুতোটা পুতুলের কান দিয়ে ঢুকিয়ে দিন।

যুবরাজ প্রথমে একটা পুতুলের কান দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে দিলো। সুতোটা আরেক কান দিয়ে বের হয়ে এলো।

উজির বললেন:

এই পুতুলটা এক ধরনের মানুষের মতো। তাদেরকে কোনও কথা বললে এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। ভেতরে কিছুই ধরে রাখতে পারে না।

যুবরাজ দ্বিতীয় পুতুলের কানে সুতো ঢোকালেন, সুতোটা পুতুলের মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো।

উজির বললেন:

এই পুতুলটা এক ধরনের মানুষের মতো, তাদেরকে আপনি যা-ই বলবেন, তারা আরেক জনের কাছে গিয়ে বলে দেবে। পেটের ভেতরে কোনও কথাই রাখতে পারবে না।

যুবরাজ তৃতীয় পুতুলটির কানে সুতো ঢুকিয়ে দিলেন। সুতো কোনও দিক দিয়েই বের হয়ে এলো না।

উজির বললেন:

এই পুতুলটা আরেক ধরনের মানুষের মতো, তাদেরকে আপনি যা-ই বলবেন কথাটা ভেতরে তলিয়ে যাবে। বের হয়ে আসবে না।

যুবরাজ প্রশ্ন করলেন:

কোন্ ধরনের মানুষ ভালো?

উজির উত্তর না দিয়ে যুবরাজকে চতুর্থ আরেকটা পুতুল দিলেন। যুবরাজ ওটার কান দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে দিলো। সুতোটা আরেক কান দিয়ে বের হয়ে এলো।

উজির বললেন:

সুতোটা আবার ঢুকিয়ে দিন। এবার সুতোটা মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো।

উজির বললেন: সুতোটা আবার ঢুকিয়ে দিন। এবার সুতোটা আর কোনও জায়গা দিয়ে বের হলো না।

উজির বললেন:

এই পুতুলটা ভিন্ন এক ধরনের মানুষের মতো। যাদের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন। এই ধরণের মানুষ জানে কখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কখন চুপ থাকতে হবে। কখন স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে।

জীবন জাগার গল্প: ৮৩

অভ্যেসের ডাল

রাজার বাজপাখি পোষার বেজায় শখ। এক সভাসদ রাজাকে অনেক উন্নত জাতের এক জোড়া বাজছানা উপহার দিলো। রাজা দেশের সেরা বাজ-প্রশিক্ষককে দায়িত্ব দিলেন। অল্প কিছুদিন পর দেখা গেলো একটা বাজ সুন্দরভাবে আকাশে উড়তে শিখে গেছে। আরেকটা বাজ ওড়াতো দূরের কথা, প্রাসাদে আনার পর থেকে জায়গা ছেড়েই নড়ছে না। একটা নির্দিষ্ট গাছের ডালে সেই যে এসে বসেছে আর নড়াচড়ার নাম নেই।

রাজ-চিকিৎসককে তলব করা হলো, কিছু হলো না। পাশের রাজ্য থেকেও পরামর্শ নেয়া হলো, কিছু হলো না।

রাজা সভাসদবর্গকে দরবারে ডেকে বললেন এর সমাধান করতে। কেউ কিছু করতে পারলো না।

শেষে রাজা বললেন:

দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ হাঁস-মোরগ পালনকারীকে ডেকে এনে দেখাও।

পরদিন সকালে রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আজ প্রাসাদের গাছে একটা বাজও নেই। দুটোই আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

রাজা অবাক হলেন, কৃষকটিকে হাজির করতে বললেন।

কৃষক এসে কুর্নিশ করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন:

তুমি কী করেছ? এক রাতেই বাজটা উড়তে শুরু করে দিল?

জাঁহাপনা! আমি শুধু ডালটা কেটে দিয়েছি।

কোন ডাল?

যে ডাল বাজটা এতদিন ধরে বসে থাকতো।

জীবন জাগার গল্প: ৮৪

ভালোমন্দের লড়াই

চাঁদনি রাত। দাদা নাতিদেরকে নিয়ে উঠোনে মাদুর পেতে বসেছেন। সবাই বায়না ধরলো একটা গল্প বলতে হবে।

দাদা বললেন, আমি তোমাদেরকে দুইটা বাঘের গল্প শোনাবো:

নাতিরা শোনো! তোমাদের প্রত্যেকের ভেতরে দুটো করে বাঘ বাস করে। বাঘ দুটো সারাক্ষণ লড়াই করছে।

দুই বাঘের এক বাঘ অত্যন্ত হিংস্র, ভয়ানক রাগী আর প্রতিশোধ-পরায়ণ। খুবই খারাপ বাঘ।

আরেকটা বাঘ অতি দয়ালু, কোমল আর ক্ষমাপরায়ণ। খুবই ভালো বাঘ।

নাতিরা ভয় পেয়ে গেলো। কই দাদা! আমরা তো কখনো কোন বাঘ দেখি নি?

দাদা বললেন, আছে আছে।

দাদা! যুদ্ধে কোন বাঘটা জিতে?

কেনো, যে বাঘকে তোমরা নিয়মিত বেশি বেশি খাবার দাও!।

জীবন জাগার গল্প: ৮৫

কাঠমিস্ত্রি

ওয়ালেস জনসন। এক আমেরিকান যুবক। এক কাঠের আড়তে কাজ করে। যুবকটা জীবনের সুন্দর সময়গুলো এই আড়তে কাটিয়ে দিলো।

যুবকটি কাঠের কাজে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠলো। অনেক কঠিন কঠিন নকশাও তার হাতের জাদুকরি ছোঁয়ায় অপূর্ব হয়ে উঠতো। যুবকটির বয়স যখন চল্লিশ তখন মালিক অন্যায়ভাবে তাকে কারখানা থেকে বের করে দিলো।

ওয়ালেস জনসন কারখানা থেকে বের হয়ে এলো। বাড়িতে এসে বউকে সব খুলে বললো। এমন কোনও সম্বল নেই যা দিয়ে সংসার চলবে। দুজন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। যুবকটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না মালিকের এহেন অকৃতজ্ঞতা।

কাঠের কারখানার কাজটিই ছিল একমাত্র জীবিকার উৎস। কী করবে ভেবে কোনও কূল কিনারা করতে পারছিলো না। রাত শেষে সকাল হলো। সকালে যুবকটি স্ত্রীকে বললো, আমাদের এই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবো। আরো সস্তায় ছোটখাট একটা ঘর ভাড়া নেবো। পাশাপাশি কাঠের ঘর বানানোর কাজ করবো।

আগের জানাশোনা এক জায়গা থেকে দুটি ছোট ঘর বানানোর ফরমায়েশ এলো। যুবক তার সারা জীবনের অর্জিত সমস্ত মেধা আর নৈপুণ্য ব্যয় করে ঘরদু'টো বানাল। ঘরদু'টো মালিকের খুবই পছন্দ হলো। এই সূত্র ধরে আরো ঘর তৈরির ফরমায়েশ আসলো। ক্রমে ক্রমে যুবকটি পুরো শহরে ছোট ঘর বানানোর একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলো।

পাঁচ বছরের টানা পরিশ্রমে যুবকটি অনেক টাকার মালিক হয়ে গেলো। এবার জমানো টাকা নিয়ে হোটেল ব্যবসায় নামলো। হোটেলের নাম দিল 'হলিডে ইন'। পরবর্তীকালে, সারা বিশ্বের বড় বড় শহরে এই হোটেলের শাখা খোলা হলো। এছাড়াও অনেক দ্বীপে বহু অবকাশ যাপন কেন্দ্র তৈরি করলো।

যুবকটি শেষ জীবনে তার আত্মজীবনীতে লিখলো:

যদি আজ আমি আমার সেই মনিবের খোঁজ পেতাম,

তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতাম।

সেদিন বুঝতে পারিনি যে, ঈশ্বর আসলে বন্ধ করেছিলেন আমার দারিদ্র্যের দরজা, আর খুলে ধরেছিলেন তাঁর করুণার দুয়ার।

জীবন জাগার গল্প: ৮৬

নিজের দোষ

বোরহান সাহেব এতদিন সরকারি চাকুরি করতেন। দু'মাস হলো অবসর নিয়েছেন। জীবনের শেষ দিনগুলো নিরিবিলিতে কাটানোর ইচ্ছা। গ্রামের বাড়িটা এতদিন খালিই পড়ে ছিলো। অবসর গ্রহণের আগে ঠিকঠাক করে রেখেছিলেন। ছেলে মন্ট্রিল থেকে বারবার বলেছে, শহরেই পছন্দসই একটা বাসা দেখে সেখানে থাকতে।

মেয়ে আর তার জামাইও ফ্রাংকফুর্ট থেকে বারবার অনুরোধ করেছে ঢাকাতেই থেকে যেতে। কিন্তু শহরে যে মন টেকে না।

ছেলেমেয়ের কথা একরকম উপেক্ষা করেই বুড়ো-বুড়ি গ্রামের বাড়িতে চলে এলেন।

বোরহান সাহেব কিছুদিন পর লক্ষ করলেন, সাবেরা আগের তুলনায় কানে কম শোনে। দূর থেকে কিছু একটা বললে উত্তর দেয় না। কাছে গেলে তবেই কথা বলে।

বউকে না জানিয়েই একদিন ডাক্তারের কাছে গেলেন।

ডাক্তার সাহেব! আমার স্ত্রীর কানে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কী সমস্যা?

সে দূরের কথা শুনতে পায় না।

কত দূর থেকে?

সেটা তো ঠিক বলতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন:

আপনি চল্লিশ গজ দূর থেকে কিছু একটা জানতে চাইবেন। যদি না শোনে তাহলে আরো দশ গজ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করবেন। এভাবে দূরত্ব কমাতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত কতটুকু দূরত্ব থেকে শোনে সেটা আমাকে এসে জানাবেন।

ঘরে এসে তিনি প্রথমে চল্লিশ গজ দূর থেকে প্রশ্ন করলেন:

ওগো শুনছো! আজ কী রান্না করছো?

স্ত্রী কোন উত্তর দিলো না।

এবার ত্রিশ গজ দূর থেকে প্রশ্ন করলেন।

এবারো কোনও উত্তর আসলো না।

এবার বিশ গজ দূর থেকে প্রশ্ন করলেন।

কোনও উত্তর পেলেন না।

এবার একেবারে কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন:

হ্যাঁ গো, কী রাঁধছো?

স্ত্রী ঝামটা দিয়ে বললো:

উফ! কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে দেখছি, আর কতবার বলবো:

আমাদের লাল মোরগটা রান্না করছি!।

জীবন জাগার গল্প: ৮৭

চলতে থাকো

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান। স্নাতকেরা পদক গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে। লোডশেডিংয়ের কারণে অনুষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘর থেকে এখানে স্থানান্তর করা হয়েছে। তীব্র দাবদাহে বদ্ধ হলঘরে সবার দম বন্ধ হয়ে আসবে। জেনারেটর দীর্ঘ সময় চলতে চলতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই খোলা মাঠে, শামিয়ানার নীচেও দর্শক-শ্রোতারা খুব একটা স্বস্তিতে নেই। সূর্য যেন আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে।

অনুষ্ঠানের সব কাজই মোটামুটি শেষ। এবার মূল পর্ব:

উপাচার্য সনদ প্রদান করবেন, এরপর ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। উপাচার্য প্রথমে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন:

এই গরমে ভাষণ দেয়া বা শোনা কোনওটারই মানসিকতা এখন কারো নেই। আমার বক্তব্য দেয়া তো মূলত স্নাতকদের উদ্দেশ্যে। সেটা আমি সনদ প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে ওদের সাথে সেরে নেবো।

সনদ গ্রহণের জন্য সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। ঘামে সবার শরীর ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

স্নাতকেরা একজন একজন করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সনদ গ্রহণ করে, মুসাফাহা করে বিদায় নিতে লাগলো। উপস্থিত সবাই উৎসুক-উৎকর্ণ হয়ে রইলো, উপাচার্য দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদেরকে কী উপদেশ দেন সেটা শোনার জন্য।

সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করলো:

চ্যান্সেলর প্রত্যেক স্নাতককে সনদ দিয়েই দৃঢ় অথচ অনুচ্চ স্বরে বলছেন (Keep moving খীপ মুভিং) চলতে থাকো।

ব্যস, এটুকুই। আর বাড়তি কোনও শব্দ উচ্চারণ করছেন না।

সামনের সারিতে বসা একজন তার পাশে বসা আরেকজনকে বললেন, উনি তো ছোট্ট দুটি শব্দে পুরো জীবন চলার পাথেয় দিয়ে দিলেন:

বর্তমানের জন্য উপদেশ:

চলতে থাকো, পরের জনকে সনদ গ্রহণের জন্য সুযোগ দাও। তুমি স্থির হয়ে থাকলে পরের জন সুযোগ পাবে না।

ভবিষ্যতের উপদেশ:

প্রতিটি অর্জন ও সাফল্যের পরও চলতে থাকো। সাফল্য পেয়ে স্থবির হয়ে যেও না। চাকুরিতে পদোন্নতি হলেও থেমে থেকো না, আরো উন্নতির জন্য 'চলতে থাকো'। এমনকি অবসর গ্রহণের পরও থেমে থেকো না অন্য কিছু করার জন্য 'চলতে থাকো'। জীবনে যত বড় প্রাপ্তিই তুমি লাভ করো এটাকে শেষ মনে না করে, শুরু মনে করে 'চলতে থাকো'। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও থেমে থেকো না, আল্লাহ তোমার জন্য সামনের দিনগুলোতে কী রেখেছেন তা আবিষ্কারের জন্য 'চলতে থাকো'।

জীবন জাগার গল্প: ৮৮

গা–ঝাড়া

কৃষকের গাধাটা গভীর কূপে পড়ে গেছে। আশেপাশে বাড়ি-ঘর নেই যে, আর কারো সাহায্য চাইবে। গাধাটা অনেক প্রিয়। চাষাবাদের বেলায় অনেক কাজে আসে।

এত গভীর কূপ থেকে গাধাটাকে তুলে আনার কোনও পথ বের হলো না। গাধাটা ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলেছে। শেষে কৃষক সিদ্ধান্ত নিলো,

গাধাটাকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলবে। এভাবে ধুঁকে ধুঁকে কষ্ট করে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়াই ভালো।

বাড়ি থেকে কোদাল এনে কূপের ভেতরে মাটি ফেলতে লাগলো। কূপের ভেতরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

কিছুক্ষণ পর গাধাটাকে আলোর সীমায় দেখা গেলো। কৃষক অবাক, গাধাটা কি বাতাসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?আরেকবার মাটি ফেলার পর সে দেখতে পেলো, গাধার গায়ে মাটিগুলো পড়ারসাথে সাথে গাধাটা গা ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলে দিলো এবং যেদিকে মাটি পড়ছে না দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালো।

আরে তাই তো! এভাবেও তো গাধাটাকে উঠিয়ে আনা যায়। কৃষক বিপুল উদ্যমে মাটি ফেলে যেতে লাগলো। গাধাটাও মাটি গায়ে পড়ার সাথে সাথেই গা ঝাড়া দিয়ে আরেক পাশে সরে দাঁড়াতে লাগলো। একসময় দেখা গেলো হাত বাড়িয়েই গাধাটাকে ছোঁয়া যাচ্ছে।

জীবন জাগার গল্প: ৮৯

হাতির রশি

পাশের গ্রামে এক জমিদার হাতি কিনে এনেছে। আশেপাশের দশগ্রামের মানুষ হাতি দেখার জন্য ভেঙে পড়লো।

সবাই গিয়ে দেখলো:

কী বিশাল বপু, কী বিরাটকায় কাঠামো। কিন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে একটা হালকা রশি দিয়ে। কোনও খাঁচা নেই। কোনও শেকল নেই। কোনও তালা নেই।

এ কী করে সম্ভব?

দর্শকদের একজন মাহুতকে প্রশ্ন করলো:

এতবড় প্রাণীটা রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না কেনো? একটু টান দিলেই তো রশি তো রশি, খুঁটিটাও যে উঠে চলে আসবে।

মাহুত উত্তর দিলো:

হাতিটা যখন বাচ্চা ছিলো তখন সেটাকে আমরা এই ছোট রশিটা দিয়ে বেঁধে রাখতাম। সেই বয়েসের জন্যে এই পাতলা রশিটাই যথেষ্ট ছিলো। প্রথম প্রথম বাচ্চাটা অনেক টানাটানি করতো, রশিটা ছিঁড়তে চাইতো, কিন্তু পারতো না। পা দিয়ে রক্ত বের হতো, আহত হতো, জখম হতো কিন্তু কোনও কাজ হতো না।

এভাবে দিন গড়ানোর সাথে সাথে হাতিটার এই বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, শত চেষ্টাতেও সে এই রশি ছিঁড়তে পারবে না। তার মনের ভেতরে এ কথাটা একদম গেঁথে গেলো। এখন বড় হওয়ার পরও তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল রয়ে গেছে যে, রশিটা তার আর ছেঁড়া হবে না। তাই সে চেষ্টাও করে না।

জীবন জাগার গল্প: ৯০

যোগ অঙ্ক

শিশুশ্রেণি, দ্বিতীয় ভাগ। অঙ্কের ক্লাস। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন।

সোনামণিরা! আজ আমরা যোগ অঙ্ক শিখবো। রাবেয়া! তুমি দাঁড়াও। আচ্ছা বলো তো:

আমি তোমাকে একটা আপেল দিলাম, তারপর আরেকটা দিলাম, তোমাকে কয়টা আপেল দিলাম?

একটা স্যার।

শিক্ষক চিন্তায় পড়ে গেলেন, কিভাবে বোঝাবেন। হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা রাবেয়া তো পেয়ারা খেতে পছন্দ করে। পেয়ারা দিয়েই জিজ্ঞাসা করি।

রাবেয়া! বলো তো তোমাকে একটা পেয়ারা দিলাম, তারপর আরেকটা পেয়ারা দিলাম। তাহলে তোমার কাছে এখন কয়টা পেয়ারা আছে?

দুইটা স্যার।

শিক্ষক খুশি হলেন। এই নতুন পদ্ধতি অন্যদের উপরও প্রয়োগ করে দেখতে চাইলেন।

আমেনা! বলো তো তোমার প্রিয় ফল কী?

কমলা।

মনে কর, তোমাকে একটা কমলা দিলাম, তারপর আরেকটা কমলা দিলাম, তাহলে তোমার কাছে এখন কয়টা কমলা আছে?

তিনটা স্যার।

শিক্ষক অবাক, তাঁর কৌশল কাজে লাগলো না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমেনা! ধরা যাক, তোমাকে একটা আপেল দিলাম, তারপর আরেকটা আপেল দিলাম। এখন তোমার কাছে কয়টা আপেল আছে?

দুইটা স্যার।

দারুণ! একদম ঠিক বলেছো। এভাবে আবার বলো দেখি, তোমাকে একটা কমলা দিলাম তারপর আরেকটা কমলা দিলাম। এখন তোমার কাছে কয়টা কমলা আছে?

তিনটা স্যার।

শিক্ষক রীতিমতো মুষড়ে পড়লেন। একটু রাগতস্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন:

একবার দিলাম একটা, তারপর দিলাম আরেকটা, সবমিলিয়ে হয় দুইটা, তুমি তিনটা কোথায় পেলে?

আম্মু টিফিনের সময় খাওয়ার জন্য একটা কমলা দিয়েছেন, সেটা ব্যাগে আছে।

জীবন জাগার গল্প: ৯১

অব্যর্থ কৌশল

ছেলেটা ডানপিটে। বানরের মতো সারাক্ষণ এ গাছে ও গাছে চড়ে বেড়াচ্ছে। এক বৃষ্টির দিনে মায়ের বারণ ঠেলে এক গাছের মগডালে চড়লো। টিয়ার বাসা থেকে টিয়াছানা পাড়বে বলে।

হঠাৎ অসাবধানে পা পিছলে গেলো। অত উঁচু থেকে বেকায়দায় পড়ে বাম হাতটা ভেঙে গেলো। চিকিৎসার পরও হাতটা সচল হলো না। অসাড় হয়ে রইলো।

বাড়ির পাশে একটা কুস্তির আখড়া আছে। সেখানে কুস্তির পাশাপাশি দিলু ওস্তাদ জুডোও শেখান। ছেলেটার বেজায় শখ সেও জুডো শিখবে। প্রতিদিন সকালে উঠেই সে আখড়ার সামনে গিয়ে বসে থাকে।

ওস্তাদকে গিয়ে কিছু বলার মতো সাহস করে উঠতে পারে না।

একদিন ওস্তাদকে একা পেয়ে সাহস করে কথাটা পাড়ল।

ওস্তাদ ছেলেটার আগ্রহ দেখে না বলতে পারলেন না। তিনি বললেন:

ঠিক আছে। মাঠে ওদের সাথে গিয়ে ব্যায়াম করোগে যাও।

ছেলেটা প্রতিদিন এসে ব্যয়াম করে। প্রায় দু'মাস হয়ে গেলো, কিন্তু ওস্তাদ তাকে কোনও কৌশল শেখান না। প্রায় তিনমাস পর ওস্তাদ তাকে একটা কৌশল শেখালেন।

ছেলেটি ওস্তাদের কাছে জানতে চাইলো:

আমি আর কোনও প্যাঁচ শিখবো না? তোমার এই শরীরে একটা প্যাঁচই শুধু শিখতে পারবে।

ছেলেটা আগপিছ না ভেবেই ওস্তাদের কথা বিশ্বাস করলো। এই একটা কৌশলই সে মন দিয়ে চর্চা করে যেতে লাগলো।

প্রায় বছর খানেক পর ওস্তাদ তাকে জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় নিয়ে গেলেন। ছেলেটির প্রথম প্রতিযোগিতা।

অবিশ্বাস্যভাবে ছেলেটা তার প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিলো। তৃতীয় লড়াইটা খুবই জমে উঠলো। প্রতিপক্ষকে হারানো কঠিন হয়ে উঠলো। মধ্যকালীন বিরতির পর প্রতিপক্ষ অধৈর্য হয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ করতে লাগলো। তখন ছেলেটা তার শেখা একমাত্র কৌশল কাজে লাগিয়ে জিতে গেলো।

ছেলেটি এভাবে একের পর এক লড়াইয়ে জিততে জিততে ফাইনালে পৌঁছে গেলো। ফাইনালের প্রতিপক্ষ ছিলো অত্যন্ত শক্তিমান, দক্ষ আর অভিজ্ঞ।

লড়াই শুরু হলো। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পর ছেলেটা বেদম মার খেতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে মনে হলো ছেলেটা আর পারবে না। রেফারি হুইশেল বাজিয়ে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাইলো। ওস্তাদ এই পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করলেন। রেফারিকে বললেন, খেলা শেষ করবেন না, ওদেরকে চালিয়ে যেতে দিন।

খেলা ফের শুরু হলো। প্রতিপক্ষ এইবার অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে, এক মারাত্মক ভুল করে বসলো। তার বুক থেকে 'সুরক্ষা বর্ম' খুলে ফেললো। ছেলেটি এই সুযোগে তার সেই একমাত্র ও অব্যর্থ কৌশলটি প্রয়োগ করলো। প্রতিপক্ষ কুপোকাত।

বাড়ি ফেরার পথে ওস্তাদ আর শাগরিদ একসাথে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। পুরো খেলার প্রতিটি নড়াচড়া, আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। কী কী ভুল হয়েছে সেটা নিয়ে পর্যালোচনা চলছে।

শাগরিদ তার ওস্তাদকে প্রশ্ন করলো:

ওস্তাদ! আমি একটা কৌশল দিয়েই কিভাবে সমস্ত প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলাম?

ওস্তাদ উত্তর দিলেন:

তুমি বিজয়ী হয়েছ দু'টি কারণে:

এক: তোমাকে যে একটা কৌশল শিখিয়েছি, সেটা জুডোর সবচেয়ে জটিল ও কঠিন অথচ অব্যর্থ কৌশল। তুমি শুধু এই একটা কৌশল নিয়মিত চর্চা করার কারণে, এই কৌশলে অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা অর্জন করেছো।

দুই: তোমার বাম হাত অকেজো। তোমার শেখা কৌশলটার প্রয়োগ বেশির ভাগই ডান হাত দ্বারা হয়। প্রতিপক্ষ প্রথমেই তোমার শরীরের সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে চায়। সেজন্য তারা তোমার বাম হাতকে ধরে। আর এটাই তোমার একমাত্র ডিফেন্স (আত্মরক্ষা)। কারণ প্রতিপক্ষ তোমার বাম হাত ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়লে, তুমি ডান হাতকে পূর্ণ শক্তিতে ব্যবহার করতে পার। তোমার দুর্বলতাই তোমার শক্তি হিশেবে কাজ করেছে।

জীবন জাগার গল্প: ৯২

নীরবতার বাণী শোনো।

এবার ফসল বেশ ভালো হয়েছে। ধানের ফলন আল্লাহ তা'আলা দু'হাত ভরে দিয়েছেন। ধান মাড়াই শেষ। খোলায় (উঠোনে) শুকিয়ে গোলায় তোলার কাজও শেষ হয়েছে। সারি-সারি অনেকগুলো গোলা।

কৃষকের মন বেজায় খুশি। এবার ঘরের ছানিটা (চাল) চেয়ে ফেলতে হবে। পাইকাররা আসতে শুরু করেছে। গতকাল লশকর হাট গিয়ে দামও যাচাই করে এসেছেন।

গতকাল বাজারে যাওয়ার পথে নৌকায় ওঠার সময় থেকেই মানু মিঞার মনে হচ্ছিল, কী যেনো নেই। অনেক চিন্তা করেও বের হলো না। উশখুশ মন নিয়ে নৌকার গলুইয়ে গিয়ে বসলেন। ছপছপ দাঁড় টানতে লাগলেন।

ছোট নৌকাটা বাজারের ঘাটের খুঁটিতে বাঁধার সময় হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়তেই কলজেটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, আরে ঘড়িটা কই?

এতক্ষণে মনের দোনোমোনো ভাবের রহস্য উদ্ধার হলো।

ঘড়িটা বিয়ের ঘড়ি। শাশুড়ি বড় আদর করে হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন:

বাজান! ঘড়িটা আমার দাদাজানের, হজ করে ফেরার সময় পোর্ট সাইদের এক সুইস নাবিক থেকে কিনেছেন। খুবই ভালো ঘড়ি।

মানু মিঞা তাড়াতাড়ি বাজারের কাজ সেরে ফিরতি পথ ধরলেন। বাড়ি আসতে আসতে আকাশে মাত্র দুটা কি তিনটা তারা বাকি ছিলো।

আসিয়া কুপি জালিয়ে অপেক্ষা করছিলো, ঘরে ঢুকতেই বললো, হাত-পা ধোয়ার পানি দাওয়ায় রেখেছি। ভাত বাড়ছি। খেতে আসেন।

মানু মিঞা ভাত খেতে বসে খাবারে ঠিক মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। ভাত নাড়াচাড়া করছিলেন। বউ পাখার বাতাস করতে করতে বলল, আরেক টুকরা মাছ দেই?

না, লাগবে না।

আসিয়া! আম্মার দেয়া ঘড়িটা পাচ্ছি না।

হায় হায়! বলেন কি? কখন থেকে?

মনে হয় দুপুরের আগে কোনও এক সময় পড়ে গেছে।

বাকি রাত ঘড়ি খুঁজেই কেটে গেলো। কোথাও পাওয়া গেলো না।

পরদিন যখন পাতাকুড়ুনি ছেলেমেয়েরা এলো। মনু মিঞা ওদেরকে বললো শোনো! আমাদের একটা ঘড়ি হারিয়ে গেছে, সেটা যে খুঁজে এনে দিতে পারবে সে পুরস্কার পাবে।

সবাই দুদ্দার করে খোঁজাখুঁজিতে লেগে গেলো। অনেকক্ষণ খুঁজেও কেউ ঘড়িটা পেলো না। পাতাকুড়ুনির দল চলে গেলো। একটা ছেলে রয়ে গেলো। সে এগিয়ে এসে বললো, আমি কি একা একা ঘড়িটা খুঁজে দেখতে পারি?

হ্যাঁ, যাও খুঁজে দেখো।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটা ঘড়ি হাতে হাজির হলো।

কৃষক অবাক। তুমি কিভাবে খুঁজে পেলে?

আমি বেশিকিছু করি নি। আমি শুধু গোলাঘরের কোণায় গিয়ে চুপচাপ বসে থেকে ঘড়িটার টিকটিক আওয়াজ শোনার চেষ্টা করেছি। একটু পরেই দেখি, গোলার এককোণ থেকে আওয়াজটা আসছে।

জীবন জাগার গল্প: ৯৩

একটুখানি পরিবর্তন!

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সমুদ্রতীরে এখন কেউ নেই। নির্জন। এক যুবক একাকী উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে কেউ নেই। অনেক দূরে আবছা দেখা যাচ্ছে কিছু একটা নড়াচড়া করছে।

যুবকটি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলো।

কাছে গিয়ে দেখলো একজন বৃদ্ধলোক, সাগরের পানির সাথে ভেসে আসা তারামাছগুলোকে ধরে ধরে পানিতে ফেলছেন।

মাছগুলো পানির ধাক্কায় তীরে বালুকাবেলায় চলে আসছে। পানি চলে যাওয়ার পর বালুতে আটকে থাকছে। সরে যেতে পারছে না। এভাবে অসংখ্য মাছ মারা পড়ছে। বৃদ্ধ লোকটা জীবিত মাছগুলো ধরে ধরে পানিতে ছুঁড়ে মারছেন।

যুবকটি অবাক হলো। বৃদ্ধটির কাছে জানতে চাইলো:

আপনি মাছগুলো কেনো পানিতে ফেলছেন?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন:

এখন তো ভাটার টান। যে মাছগুলো বালুতে আটকা পড়ছে সেগুলো তো পানিতে ফিরে যেতে পারবে না। তাই সেগুলোকে পানিতে ফেলছি।

যুবকটি বললো:

কিন্তু পুরো সমুদ্রতীর জুড়ে হাজার হাজার মাছ আটকা পড়েছে। আপনি তো সবগুলো মাছকে পানিতে ফেলতে পারবেন না। এই দুয়েকটা মাছকে বাঁচিয়ে আপনি অবস্থার তো খুব একটা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

বৃদ্ধ লোকটি প্রত্যুত্তরে হেসে উবু হয়ে আরেকটি মাছ তুলে নিয়ে বললেন:

এই মাছটা পানিতে ফেললাম, অন্তত এটার অবস্থার তো পরিবর্তন ঘটাতে পারলাম!।

জীবন জাগার গল্প: ৯৪

গালি ও ছেঁড়া জুতো!

দাদা নাতিকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার আরেক পাশ থেকে এক যুবক অশ্রাব্য ভাষায় দাদাকে গালিগালাজ শুরু করে দিলো। দাদা নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওপাশের যুবকটিরগালিগালাজ শেষ হলে, দাদা মুচকি হেসে নিজ পথে রওয়ানা দিলেন। নাতি জিজ্ঞাসা করল, দাদাভাই, আপনি লোকটার কথার জবাব না দিয়ে শুধু হাসলেন কেন?

দাদা কোনও কথা না বলে, নাতির হাত ধরে বাড়ির পেছনে নিয়ে গেলেন। সেখানে বাড়ির পুরোনো পরিত্যক্ত জিনিসপত্র স্তূপ করে রাখা আছে। ওখান থেকে একজোড়া ছেঁড়া-ময়লা জুতো বের করলেন। নাতিকে বললেন, এটা পায়ে দাও তো দেখি!

নাতি উষ্মাভরেই উত্তর দিলো:

এই ময়লা জুতা কিভাবে আমি পায়ে দেবো? এটা কি আমার জুতো? আমার জুতো তো আমার পায়েই আছে। এই ময়লা-ছেঁড়া জুতো পায়ে দেয়াও তো ঠিক নয়।

দাদা বললেন, এবার তুমিই বলো, ওই লোকটির গালিও কি আমার জন্য মানানসই?

না দাদাভাই!

তাহলে ওই গালি আমাকে দেয়নি। ওর গালির জুতো আমার পায়ে লাগবে না।

জীবন জাগার গল্প: ৯৮

ফুলদানি

গ্রামের শেষ প্রান্তে একজন গরিব লোক বাস করে। লোকটা ছিলো অলস প্রকৃতির। অভাব-অনটনে জর্জরিত। ঘরদোর ময়লা আর আগোছালো। লোকটার কুঁড়েমির কারণে তার বাড়িটা একটা ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধে ভূত পর্যন্ত পালায় অবস্থা। মরা আরশোলাগুলো ঘিরে জ্যান্তগুলোর অদ্ভুত শোকসভা। পুরো ঘর জুড়ে ইঁদুরের গর্ত। সারা ঘর মাকড়সার জালে ছাওয়া। এহেন অবস্থা দেখে পাড়া প্রতিবেশীরাও তার বাড়ির ত্রিসীমানায় খুব একটা ঘেঁষে না।

এতসব কারণে লোকটা নিজেকে অপয়া আর দুর্ভাগা মনে করে।

গ্রামে একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ লোক থাকেন। সবাই বিপদাপদে তার কাছে পরামর্শের জন্য ছুটে যায়।

অলস লোকটাও গেলো। জ্ঞানী লোকটিকে নিজের অভাব-অনটন আর দুর্ভাগ্যের কথা খুলে বললো।

জ্ঞানী বৃদ্ধ, লোকটার শোচনীয় অবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। তাকে একটা সুন্দর ফুলদানি দিয়ে বললেন:

এটা একটা আশ্চর্য ফুলদানি, এটা তোমার অবস্থা পরিবর্তনে সহায়তা করবে।

দরিদ্র লোকটা ফুলদানিটা নিয়ে ফিরে এলো। বাজার দিয়ে হেঁটে আসার সময় ভাবলো এই সুন্দর ফুলদানিটা দিয়ে আমি কী করব? বরং এটাকে বিক্রি করলে অন্তত কিছু খাবারের ব্যবস্থা হবে।

ফুলদানিটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে তার মনে হলো, এমন সুন্দর জিনিসটা বিক্রি করে ফেলবো? আচ্ছা আজ বাড়ি নিয়ে যাই। কাল দেখা যাবে, বিক্রি করা যায় কিনা।

বাড়িতে এসে ফুলদানিটা টেবিলের উপর রেখে দিলো। তার মনে হলো, এত সুন্দর ফুলদানিটা এমনি এমনি খালি পড়ে থাকবে?

বাড়ির পেছনের ঝোপ থেকে কিছু বুনো ফুল এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলো।

দূর থেকে তাকিয়ে দেখলো, নাহ, চমৎকার দেখাচ্ছে। কিন্তু ফুলদানিটার পাশে মাকড়সার জালটাতো মানাচ্ছে না?

লোকটা এবার পুরো ঘরের মাকড়সার জালগুলো পরিষ্কার করলো। এটুকু যখন করলাম, বাকী ময়লাও পরিষ্কার করে ফেলি না কেন?

এবার ইঁদুরের গর্তগুলো ভরাট করে দিলো। মরা-জ্যান্ত নির্বিশেষে আরশোলাগুলোকে ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলে দিলো।

এরপর কী ভেবে বাড়ির বেড়াগুলোতে হালকা করে শাদা রঙও লাগিয়ে দিলো। এই করতে করতে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসলো। কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়লো—টেরও পেল না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের ঘরের অবস্থা দেখে লোকটা চমকে উঠলো। নিজের ঘর বলে বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আশেপাশে তাকিয়ে নিজেকে গরিব-দুর্ভাগাও মনে হচ্ছিল না।

ঘরটাকেও তার আগের তুলনায় আরো আরামদায়ক আর সুন্দর মনে হতে লাগলো। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করে, মনে হচ্ছে আমি তো চাইলে কাজও করতে পারি। ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে এসে দেখলো, পুরো বাড়ি জংলা-আবর্জনায় ভরে আছে। সে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেমে পড়ল। এখন আর দুর্ভাগ্য নিয়ে ভাবনার সময় কোথায়?

জীবন জাগার গল্প: ৯৬

টিপস

অনেক আগেকার কথা, লন্ডনের ব্রুকলিনের একটি কফি শপ। দরজা ঠেলে এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর ঢুকলো। খালি দেখে একটা টেবিলে বসলো। ওয়েটার গ্লাসে করে পানি এনে রাখলো।

কিশোর জিজ্ঞাসা করলো:

একটা বাদামের আইসক্রিম কত?

পঞ্চাশ সেন্ট।

কিশোর পকেটের টাকা গুনে দেখলো। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলো, ছোট একটা কাপ আইসক্রিম কতো?

ওয়েটার বিরক্ত হলো। আরো কিছু খদ্দের ফরমায়েশ দিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের ফরমায়েশ পালন করলে তো মোটা বখশিশ পাওয়া যাবে। এ পুঁচকে কালো ছেলের কাছ থেকে তো বখশিশ মিলবে না। কিছুটা উত্তপ্ত স্বরেই ওয়েটার জবাব দিলো:

পঁয়ত্রিশ সেন্ট।

কালো কিশোর আবার পকেটের টাকা গুনে দেখে বললো, আমি কাপ আইসক্রিমই খাবো।

ওয়েটার কাপ আইসক্রিম এনে দিলো। সে অন্য টেবিলে মনোযোগ দিলো। কিশোর আইসক্রিম শেষ করে, ক্যাশিয়ারের কাছে দাম পরিশোধ করে বের হয়ে গেলো।

একটু পরে ওয়েটার টেবিল পরিষ্কার করতে এসে, থ মেরে গেলো। খালি কাপটার পাশে পনেরো সেন্ট রাখা আছে। তার টিপস (বখশিশ)।

জীবন জাগার গল্প: ৯৭

হার না মানা স্বপ্ন

একটি ছেলে। তার পিতা একজন ঘোড়া-প্রশিক্ষক। অন্যের অধীনে চাকুরি। তাই আজ এখানে তো কাল ওখানে। এক আস্তাবল থেকে আরেক আস্তাবলে। এক র‍্যাঞ্চ থেকে আরেক র‍্যাঞ্চে। এক খামার বাড়ি থেকে আরেক খামার বাড়ি।

বাবার এই ঘোরাঘুরির চাকুরিতে, ছেলেটার ইশকুল জীবনটা বারবার বিঘ্নিত হতে থাকলো।

উপরের ক্লাসে পড়ার সময়, ‘বড় হলে তুমি কী হতে চাও’ শিরোনামে একটা রচনা লিখতে বলা হলো।

ছেলেটা কোনও দ্বিধা ছাড়াই সাত পৃষ্ঠার একটি জীবন পরিকল্পনা লিখে ফেললো।

আমার লক্ষ্য: আমি একটি ঘোড়ার র‍্যাঞ্চের মালিক হব। টেক্সাসের গহীন অরণ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে থাকবে সেই খামার বাড়ি।

এছাড়াও ছেলেটা তার র‍্যাঞ্চে কয়টা ভবন থাকবে, সেগুলো কেমন হবে, কোথায় কী থাকবে সব বিস্তারিত লিখলো। লেখা শেষ করে সে রচনা জমা দিলো।

দুদিন পর সে লেখাটা ফেরত পেলো ওপরে বড়সড় অক্ষরে লাল কালিতে লেখা 'এফ' (ফেল)।

ক্লাসের পর সে শিক্ষকের কাছে গেলো। জিজ্ঞাসা করলো:

আমার রচনার ভুলটা ধরিয়ে দিলে খুশি হতাম।

শিক্ষক বললেন:

এই স্বপ্ন তোমার মতো ছেলের জন্য অবাস্তব। তোমার বাবার কোন অর্থ নেই, বিত্ত নেই। চালচুলো নেই। তোমার বাবা একজন ভবঘুরে সহিস। কোথাও কোনও স্থিতি নেই। এমন স্বপ্ন দেখা তোমার জন্য সাজে না।

তারপর শিক্ষক তাকে পুনরায় কোনও বাস্তবভিত্তিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লিখে আনতে বললেন।

ছেলেটা বাড়ি এসে পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো:

আমি এখন কী করতে পারি?

বাবা বললেন:

এই সিদ্ধান্ত তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তুমিই ঠিক করো, তুমি কী করতে চাও।

কয়েকদিন পর ছেলেটা সেই একই রচনা পুনরায় লিখে এনে জমা দিলো। কোনও পরিবর্তন না করেই। শিক্ষককে বললো:

স্যার, আপনি চাইলে আপনার 'এফ' বহাল রাখতে পারেন। আমিও আমার স্বপ্ন বহাল রাখলাম।

ছেলেটা এখন প্রৌঢ়। সে এখন চার হাজার স্কয়ার ফিট আয়তনের এক ঘরের মালিক। দুইশত একর জুড়ে বিস্তৃত এক ঘোড়া-খামারের গর্বিত মালিক।

এখনো তার অফিসে, কাঁচ দিয়ে বাঁধাই করা সেই ইশকুল রচনাটি আছে।

জীবন জাগার গল্প: ৯৮

কল্পনার বাগান

এক হাসপাতাল। পাশাপাশি দুই শয্যায় দুইজন মুমূর্ষু রোগী শুয়ে আছেন। একজন কাত হয়ে আছেন। গাড়ি দুর্ঘটনায় পুরো মেরুদণ্ড আর বামপাশটা মারাত্মকভাবে আহত। শুধু ডানকাত হয়ে শুয়ে থাকতে পারেন। বসতেও পারেন না। দাঁড়াতেও পারেন না। তাকে সারাক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। দিনের নির্দিষ্ট একটা সময় শুধু জাগিয়ে রাখা হয়। এই সময়ে তার ক্ষতস্থানগুলো ড্রেসিং করা হয়। তার আক্রান্ত ফুসফুস থেকে পানি বের করা হয়। লোকটা ব্যথায় কাতরাতে থাকে। গোঙাতে থাকে।

হাসপাতালের কেবিনটিতে একটি মাত্র জানালা। জানালার পাশে আরেক জন রোগীর শয্যা। পাশের লোকটিকে ব্যথায় ছটফট করতে দেখে তার খারাপ লাগলো। লোকটাকে ব্যথা ভুলিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো।

আহত লোকটাও প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো। দুজনেই নিজের জীবনের কথা, পরিবারের কথা, চাকরি-বাকরির কথা, ঘর-বাড়ির কথা বললো।

জানালার পাশের লোকটা বললো, আমাদের জানালার বাইরে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আছে।

কী আছে?

সামনেই সুন্দর একটি বাগান আছে। বাগানের পুবপাশে একটা পুকুর আছে। পুকুরে সুন্দর হাঁসেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় এক বৃদ্ধ লোক বড়শি পেতে বসে আছে। তার পাশে ছোট ছোট দুই ছেলে মেয়ে ছোটাছুটি করছে। দূরে আকাশের গা ঘেঁষে একটা বিমান উড়ে যাচ্ছে। পাশের বাড়ির ছাদে কতগুলো ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

প্রতিদিনই দুজনে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতো। জানালার পাশের লোকটা বাইরের সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো বর্ণনা করতো, আহত লোকটি অপর দিকে কাত হয়ে শুয়ে থেকে তন্ময় হয়ে শুনতো। তার ব্যথার কথা ভুলে যেতো। এভাবেই দুই রোগীর জীবন কেটে যাচ্ছিলো।

এক রাতে জানালার পাশের লোকটা মারা গেলো। আহত লোকটা অত্যন্ত ব্যথিত হলো।

কয়েকদিন পর, বিকেলে জেগে থাকার সময়, আহত লোকটা নার্সকে বললো:

আমাকে কি জানালার দিকের শয্যাটাতে স্থানান্তর করতে পারেন?

কেনো পারবো না? অবশ্যই পারবো। কিন্তু আপনার জন্য এই শয্যাতেই সবকিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওপাশে কেনো যেতে চাচ্ছেন?

আমি জানালাটা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে চাই। সারাক্ষণ অন্ধের মতো শুয়ে থাকতে থাকতে একঘেয়েমি ধরে গেছে।

নার্স বললো:

জানালার ওপাশে তো কিছু দেখা যায় না। আরেকটা ভবনের কালো দেয়াল জানালাটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

তাহলে এতদিন আমার পাশের লোকটা আমাকে কিভাবে জানালার বাইরের দৃশ্য দেখে দেখে বলতো?

নার্স বললো:

পাশে রোগীর কথা বলছেন? তিনি তো অন্ধ ছিলেন। উনি বোধ হয় আপনাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই নিজের কল্পনা থেকে বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের কথা সাজিয়ে বলতেন।

জীবন জাগার গল্প: ৯৯

একজন পিতা ও একটি কাক

করিম সাহেবের দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হয়ে গেলো। ডাক্তার বলেছেন পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে। আবার ডায়াবেটিস থাকাতে ডাক্তার প্রতিদিন কিছুক্ষণ হাঁটতেও বলে দিয়েছেন।

বয়স আশি পার হয়ে গেছে। একা একা হাঁটতে বের হতে ভরসা পান না। ছেলেটাকে নিয়ে বের হন। বাসার পাশে পার্কের ভেতরেই কয়েক চক্কর দিয়ে দেন। হাঁপ ধরে যায়। বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর বাসার পথ ধরেন।

একদিন বেঞ্চে বসে আছেন। কুয়াশার কারণে বেশি দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

সামনের গাছে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, শিবু (শিহাব) গাছে ওটা কী নড়াচড়া করছে।

ছেলে উত্তর দিলো, কাক।

কতক্ষণ পর আরেক ডালে একটা কিছু দেখে আবার প্রশ্ন করলেন, শিবু ওটা কী?

ওটা একটা কাক।

এবার গাছের নিচেই নড়াচড়া দেখলেন, শিবু ওটা কী?

ছেলে বিরক্ত হয়ে বললো আর কয়বার বলবো, ওটা একটা কাক। দেখতেই তো পাচ্ছ। এখন তো নিচে নেমে এসেছে।

পিতা ছেলের রাগ দেখে আর কথা বাড়ালেন না।

বাসায় পৌঁছে ছেলেকে বললেন, আমার কামরায় একটু আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাবো। ধর এই লেখাটা পড়।

ছেলে দেখলো, ওটা বাবার দিনলিপির খাতা। সেখানে লেখা আছে। আজ শিহাবকে নিয়ে বাসার সামনে বসে আছি। এমন সময় একটা কাক এলো। সে বললো, আব্বু! এতা কি?

- এটা একটা কাক।
- আব্বু কাক কী?
- কাক একটা পাখি।
- আব্বু পাখি কী?
- পাখি হলো আল্লাহর সৃষ্টি।

এরপর সে আমাকে প্রায় বিশবারের চেয়েও বেশি জিজ্ঞাসা করলো, আব্বু এতা কী?

আমি মজা পেলাম, তাকে প্রতিবারই বললাম এটা একটা কাক। তারপর সেই আগের মতোই প্রশ্ন , কাক কী?...... ।

জীবন জাগার গল্প: ১০০

গোয়েন্দার হালচাষ

এক মিথ্যা মামলায় ছেলে জেলে গেলো। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা। উপার্জনক্ষম ছেলের মেহনতের টাকাতেই বুড়োবুড়ির দিন গুজরান হতো। ছেলে সারাদিন পরিশ্রম করে বাবা-মার মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতো।

বাড়ির পাশের জমিটা ছেলে একাই লাঙল দিতো। বৃদ্ধ বাবা শুধু বীজটা ফেলে দিতেন। এবার ছেলেটা নেই। বৃদ্ধ পিতা চোখে অন্ধকার দেখলেন। অন্যকে ডেকে লাঙল দেয়ার মতো সঙ্গতি নেই।

বাবা ছেলেকে চিঠি লিখে জানালেন:

বাছারে! তুমি কেমন আছো? এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি ছাড়া আমাদের দুজনের যে আর কেউ নেই। তুমি না থাকাতে এবার আউশের চাষটা বোধ হয় আর করা গেলো না। লাঙল দিয়ে দেবে কে? ভালো থেকো, নিয়মিত নামায পড়ো। আমি আর তোমার আম্মা তোমার জন্য সবসময় দুআ করি। আগামী মাসে কোর্টে মামলা উঠবে। তখন দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ছেলে চিঠির উত্তরে লিখলো:

আব্বাজি! আম্মাকে আমার সালাম দিবেন। তার পাঠানো আচার আমরা সবাই ভাগ করে খেয়েছি। তাকে আর কিছু পাঠাতে নিষেধ করবেন। আম্মার চোখের ছানিটার চিকিৎসা তো আর হলো না। আল্লাহ আমাকে বের করলে, যেভাবেই হোক আম্মার চোখের ছানিটা কাটিয়ে ফেলবো। আমার এক জেলমেট বলেছে তার ভাই ডাক্তার। সে বলে দিলে এমনিই চিকিৎসা করে দেবে।

আব্বাজি! আপনি এবার পুব-পাথারের জমিটাতে লাঙল দেবেন না। ওখানে আমি একটা জিনিস মাটিচাপা দিয়ে রেখে এসেছি। দু'আ করবেন।

কারা সেন্সর বোর্ড চিঠি পড়েই ত্বরিত তদন্তদল পাঠালো। এই হত্যা মামলার গুম করা লাশ পাওয়া যাচ্ছিলো না। এবার পাওয়া গেছে।

তদন্ত দল গিয়ে পুরো জমি খুঁড়ে ফর্দাফাঁই করে ফেললো। কিছুই পেলো না।

ছেলে চিঠি লিখলো:

জমি কর্ষণের ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার সাধ্যে এটুকুই ছিলো। এবার আস্তে আস্তে জালা (ধানের চারা) রোপণ করে ফেলুন।

জীবন জাগার গল্প: ৯০৯

এ্যাডমিরাল

বিমান আকাশে উড়াল দিয়েছে। এক আরব যুবক একমনে ই-বুক-রিডার থেকে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করছে। জান্নাতের আয়াত আসলে হাসছে, জাহান্নামের আয়াত আসলে ফুঁপিয়ে উঠছে। পাশের আসনের স্যুটেড-বুটেড প্রৌঢ় যাত্রী তার দিকে বিরক্তির দৃষ্টিপাত করছে।

শেষমেশ লোকটা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলো:

তুমি একবার হাসছো আরেকবার কাঁদছো কেনো?

আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা পরকালে স্বর্গের কথা বলেছেন। আবার নরকের কথাও বলেছেন।

এই কুরআন কে লিখেছেন?

এটা কেউ লিখেন নি, এটা আমাদের রাসূলের (সা.) উপর মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

ও তুমি মুসলিম? তোমাদের রাসূলের নাম তো মুহাম্মাদ?

জ্বি।

আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানেন?

জানি, ভালো করেই জানি। তোমাদের রাসূল সম্পর্কেও জানি। তুমি কি জানো, আমি কে?

জ্বি না, জানি না।

আমি একজন এ্যাডমিরাল। নৌবাহিনীর প্রধান। তোমাকে একজন মৃত মানুষের রেখে যাওয়া বই পড়ে কাঁদতে দেখে অবাক লাগছে। এর চেয়ে একজন জীবিত মানুষের 'কমান্ড' মেনে চলা কি অধিক যুক্তিযুক্ত নয়? আমি তো তোমার রাসূলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

কিভাবে?

আমার একটা কমান্ডেই বিশ হাজার মেরিন সেনা দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

যুবকটি বললো: আরো দশ হাজার মেরিন বাড়িয়ে দিলে, তারাও কি আপনার কথা শুনবে?

তারা যদি আমার কাছে ট্রেনিং পেয়ে থাকে, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আস্থা রাখতে পার। ওদেরকে ঠিক করতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না।

যদি তারা এক ভাষাভাষী না হয়? একবয়সী না হয়? যদি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য একত্র করে দেয়া হয় তাহলেও কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

এ্যাডমিরাল উত্তর দিলেন:

অসম্ভব। এটা কেউই পারবে না।

যুবকটি তখন তার ই-বুকরিডারে কা'বা শরীফে নামাযের দৃশ্য সম্বলিত একটা ভিডিও বের করে দেখালো। দেখুন কিভাবে একজন মানুষের কমান্ডে

লাখ লাখ বিভিন্ন ভাষার মানুষ ওঠাবসা করছে। এ সবকিছুই আমাদের রাসূলের রেখে যাওয়া আদর্শকে মেনেই হচ্ছে। তিনি অনেক দিন আগে চলে গেলেও তার 'কমান্ড' বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। তাঁর (সা.) থেকে বড় কোনও নেতা কি হতে পারে? আপনিই বলুন।

জীবন জাগার গল্প: ১০২

গুহা-মাদরাসা

ডক্টর সায়ীদ হারিব। দুবাই তাহফীজুল কুরআন সংস্থার উপ-প্রধান। তিনি একটা ঘটনা বলেছেন:

সেবার হিফজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো মধ্য এশিয়ার এক ছেলে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত এক দেশের ছেলে। বয়স দশ কি এগারো বছর হবে।

ছেলেটা এত সুন্দর তিলাওয়াত করতো, এত ভালোভাবে তিলওয়াত করতো যে, প্রতিযোগিতায় উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার তিলাওয়াত বারবার শোনা হচ্ছিলো। সবাই তন্ময় হয়ে তার তিলাওয়াত শুনতো। তার তিলাওয়াত শুরু হলেই হলঘরে উপস্থিত সবার কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেতো।

প্রতিযোগিতা শেষে আমরা তার একটা বিশেষ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেখানে আমরা চমকপ্রদ কিছু বিষয় জানতে পেরেছি। তাকে প্রশ্ন করলাম:

- কে তোমাকে এত সুন্দর করে হিফজ করতে শিখিয়েছে?

- আমার আব্বু।

- তোমার আব্বু কিভাবে কুরআন শিখলেন?

- আব্বু শিখেছেন দাদার কাছে।

আমরা অবাক হলাম। তার দাদার আমলে তো সোভিয়েত শাসন ছিলো। তখন কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ ছিলো। মসজিদ নিষিদ্ধ ছিলো। ধর্মপালন নিষিদ্ধ ছিলো। এত বাধার বেড়াজাল ডিঙিয়ে কিভাবে কুরআন শিক্ষা জারি রাখা সম্ভব হলো? কারো কাছে কুরআন পাওয়া গেলেই কেজিবির লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে যেতো। আর ওই লোকের কোন হদিস পাওয়া যেতো না।

আব্বু বলেছেন:

আমার আব্বু আমাকে কোলে করে গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতেন। গ্রামের সীমানা পার হয়ে পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়ে আমার দুচোখ পট্টি দিয়ে বেঁধে দিতেন। এরপর আবার চলতে থাকতেন। অনেকক্ষণ চলার পর, একটা গুহা আসতো। সেই গুহা পার হলে একটা প্রশস্ত জায়গা ছিলো। সেখানে গিয়ে আব্বু আমার চোখ খুলে দিতেন। সেটা ছিলো চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত একটা প্রশস্ত চত্বর।

এরপর আব্বু পাহাড়ের খোপ থেকে কাপড় দিয়ে মোড়ানো কুরআন কারীমের কতগুলো পৃষ্ঠা বের করতেন। একটা একটা করে পৃষ্ঠা নিয়ে আমাকে পড়াতেন। আমাকে মুখস্থ করাতেন।

এরপর আগের মতো আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতেন।

তোমার দাদা চোখ বেঁধে দিতেন কেন?

আব্বু বলেছেন, গোয়েন্দারা এসে মাঝেমধ্যে গ্রামের লোকদেরকে ধরে নিয়ে যেতো। নির্যাতন করে কথা বের করার চেষ্টা করতো। তাই গুহা-মাদরাসার অবস্থান ঘুর্ণাক্ষরেও যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো।

আব্বু আরো বলেছেন:

আরো অনেক পিতা সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। কেউ কারো কাছে স্বীকার করতেন না। সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শিখতো।

জীবন জাগার গল্প: ৯০৩

সাহাবি

রিয়াদের একটি প্রাথমিক স্কুল। গল্প বলার ক্লাস। শিক্ষক ছোট ছোট ছাত্রদের সবাইকে বললেন:

আজ তোমরা গল্প বলবে আমি শুনবো। প্রথমে একজন একজন করে সবাই বলবে তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?

একজন দাঁড়িয়ে বললো: আমি একজন পাইলট হতে চাই। আরেকজন বললো আমি একজন নাবিক হতে চাই। আরেকজন বললো আমি একজন খেলোয়াড় হতে চাই।

এভাবে সবাই যে যার মতো ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বললো।

হঠাৎ একটা ছেলে বললো: আমি বড় হয়ে রাসূলের (সা.) সাহাবি হতে চাই।

তার কথা শুনে অন্য ছেলেরা হেসে দিলো। শিক্ষক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেনো তুমি সাহাবি হতে চাও?

আম্মু প্রতিদিন রাতে ঘুমের আগে আমাকে সাহাবিগণের গল্প শোনান। তারা খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তারা নবীজিকে ভালোবাসতেন। নবীজিও তাদেরকে ভালোবাসতেন। সাহাবিরা আল্লাহকে ভালোবাসতেন। আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসতেন। সাহাবিদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করা আছে।

আম্মু সবসময় সাহাবিগণের গল্প বলেন। আমার মনে হয়েছে সাহাবিরা নিশ্চয় অনেক বড় মানুষ। না হলে আম্মু সবসময় তাদের গল্প বলবেন কেনো?

জীবন জাগার গল্প: ১০৪

মাগার দাড়ি নেই

একবার কলকাতার এলবার্ট হলে সৈয়দ আমীর আলিকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হলো। সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হলো। ওনার কৃতিত্ব, অর্জন, যোগ্যতা, আর মেধা নিয়ে ব্যাপক মতবিনিময় হলো। আলোচনা শেষ হলো। মানপত্র পাঠও শেষ হলো।

সভা প্রায় শেষ পর্যায়ে।

এমন সময় একজন অপরিচিত, অবিন্যস্ত পোশাকাশাকধারী লোক দাঁড়িয়ে সঞ্চালকের কাছে কিছু বলার অনুমতি চাইলো।

সঞ্চালক ইতস্তত করতে লাগলো। কিন্তু লোকটার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িতে কতকটা বাধ্য হয়েই তার দিকে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিলো।

লোকটা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পুরো হল্ জুড়ে পিনপতন নীরবতা। এরপর গলা খাঁকারি দিয়ে তার কথা শুরু করলো।

সৈয়দ আমীর আলী অনেক বড় ব্যক্তিত্ব, তিনি জীবনে এই করেছেন, সেই করেছেন, তিনি মুসলিম সমাজের একজন নক্ষত্র 'মাগার'------!

লোকটা 'মাগার' বলে আর কিছু বলে না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে, আবারো, এতক্ষণ ধরে বক্তারা যা যা বলে গেলেন তার পুরো ফিরিস্তি দিয়ে, লম্বা প্রশস্তি গাঁথা শেষ করে 'মাগার' (কিন্তু) বলে থেমে গেলো।

শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন আর ফিসফাস শুরু হয়ে গেলো। সৈয়দ আমীর আলী এতবড় ব্যক্তিত্ব, ওনার আবার 'মাগার' মানে গোপন কোনও ঘটনা (ব্যাপার-স্যাপার) আছে না কি?

লোকটা তৃতীয়বারের মতো প্রশংসা শেষ করে বললো:

তিনি মুসলমানদের শির, তিনি মুসলমানদের গৌরব, তিনি প্রথম মুসলিম জজ। তিনি ইসলাম বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা, মাগার ওনার 'দাড়ি' নেই।

জীবন জাগার গল্প: ৯০৮

রাখালের কুকুর

বাগদাদ দখলের পর হালাকু খাঁর মেয়ে ঘুরতে বের হলো। পথিমধ্যে সে দেখলো, একদল লোক একজন লোককে ঘিরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হালাকুকন্যা কৌতূহলী হয়ে লোকটি সম্পর্কে জানতে চাইলো, খবর নিয়ে জানা গেলো লোকটি একজন আলিম। সে আলিমকে হাজির করতে বললো। মুসলিম আলিমটি যখন সম্রাটকন্যার সামনে এলেন, সম্রাটকন্যা প্রশ্ন করলো:

তোমরা কি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নও?

- অবশ্যই।

- তোমরা কি বিশ্বাস করো না যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে সাহায্য করেন?

- অবশ্যই।

- আল্লাহ কি তোমাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করেন নি?

- অবশ্যই।

- তার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়?

- না।

- কেনো?

- তুমি রাখাল চেনো তো?

- হ্যাঁ, চিনি।

- রাখালের সাথে কি একদল কুকুর থাকে না?

- অবশ্যই থাকে।

- যখন কোনও মেষ বিক্ষিপ্ত হয়ে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন রাখাল কী করে?

- রাখাল মেষগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কুকুর পাঠায়।

- কুকুর কতক্ষণ মেষগুলোকে তাড়িয়ে বেড়ায়?

- যতক্ষণ পর্যন্ত মেষগুলো ছত্রভঙ্গ থাকে।

আলিম: হে তাতারি! তোমরা হলে আল্লাহর জমীনে তার কুকুরের দল। যতদিন পর্যন্ত আমরা আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে থাকবো, তার আনুগত্য থেকে সরে থাকবো, তোমরাও ততদিন পর্যন্ত আমদের পেছনে লেগে থাকবে। যতদিন না আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসি।

জীবন জাগার গল্প: ১০৮

অন্যরকম দান

একজন আলিম হাঁটছিলেন, সাথে সাথে এক শিষ্যও হাঁটছে। মেঠো পথ ধরে। পথিমধ্যে তারা দেখলেন, একপাটি পুরনো জুতা পড়ে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে জুতোর মালিক খুঁজলেন। পাশের জমিতে এক লোক কাজ করছে। জুতোজোড়া তারই হবে হয়তো। লোকটির হাবভাব দেখে মনে হলো, কিছুক্ষণ পরেই তার হাতের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

শিষ্য বললো, আমি শ্রমিকটির জুতোজোড়া কোথাও লুকিয়ে রেখে দেখি, লোকটি জুতো না পেয়ে কেমন দিশেহারা আর জব্দ হয়!

শায়খ উত্তর দিলেন: প্রিয় বৎস! আর দশজন যেভাবে আনন্দ খোঁজে, তুমি চাইলে, ভিন্নভাবে আরো বেশি আনন্দ লাভ করতে পারো।

তুমি জুতো না লুকিয়ে, জুতোর ভেতরে কিছু টাকা রেখে দাও। আড়ালে গিয়ে লক্ষ করো, টাকা দেখে দিনমজুরটা কী করে।

উস্তাযের প্রস্তাব ছাত্রের খুবই মনঃপূত হলো। সে জুতোর মধ্যে কিছু টাকা রেখে দিলো। গাছের আড়ালে গিয়ে, দুজনে দরিদ্র কৃষকের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায় রইলো।

কিছুক্ষণ পর দরিদ্র শ্রমিকটি খেতের কাজ শেষে, শীর্ণ দেহে, জীর্ণ বস্ত্রে জুতো নিতে আসলো। জুতো পায়ে দিতে গিয়ে দেখলো পা ঢুকছে না, ভেতরে কিছু একটাতে পা আটকে যাচ্ছে। জুতোর আবার কী হলো? গজরাতে গজরাতে কৌতূহলভরে জুতোর ভেতরে হাত দিলো। হাত বের করে আনার পর যা দেখলো তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ। এতো দেখি টাকা! ধড়মড় করে জুতোর আরেক পাটি হাতড়ে দেখে সেটাতেও টাকা।

হতভম্ব হয়ে টাকার দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো। স্বপ্ন দেখছে না জেগে আছে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চোখ রগড়ে আবার তাকালো, না সত্যি সত্যিই টাকা। আশপাশে তাকিয়ে দেখলো, নাহ, কেউ নেই। টাকাগুলো পকেটে রেখে নতজানু হয়ে বসলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে কান্নামিশ্রিত স্বরে আল্লাহকে সম্বোধন করে বললো:

ইয়া রাব! আপনার অশেষ শুকরিয়া, আপনি তো জানেন আমার স্ত্রী অসুস্থ, আমার সন্তানরা ক্ষুধার্ত। ঘরে খাবার নেই। পকেটে কানাকড়িও নেই। আপনিই আমার সন্তানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালেন। স্ত্রীকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শিষ্যটি এই দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। তার অশ্রুসজল চোখ দেখে শায়খ বললেন:

তুমি কি এখন বেশি সুখী আর আনন্দিত নও? যদি তোমার ভাবনা মতো জুতোগুলো লুকিয়ে রাখতে তাহলে বেচারার কী দশা হতো? আর আমরাই বা কিভাবে তার পরিবারের করুণ দশার কথা জানতে পারতাম?

শিষ্য বললো, আমি এইমাত্র যা শিখলাম, যতদিন বেঁচে থাকবো, ভুলবো না।

শায়খ বললেন: যখন তুমি কাউকে কিছু দেবে, তখন তোমার আনন্দ বেশি হবে, কারো থেকে কিছু নেয়ার চেয়ে।

শিষ্য বললো: কথাটা আমি আগেও শুনেছি। অর্থ বুঝতে পারি নি। এখন বুঝেছি।

শায়খ বললেন, দান কয়েক প্রকার:

(এক) প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা এক প্রকার দান।

(দুই) তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করাও এক প্রকার দান।

(তিন) তোমার ভাই কোনও দোষ করলে তার স্বপক্ষে ওযর খোঁজা এবং তার প্রতি মন্দ ধারণা দূর করাও এক প্রকার দান।

(চার) তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মানহানি হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকাও এক প্রকার দান।

এই দানগুলো এমনঃ-

যা করার সামর্থ্য শুধু বিত্তবানদেরই নয় – বিত্তহীনদেরও আছে।

জীবন জাগার গল্প: ৯০৭

বালু ও পাথরের খোদাই

সাহারা মরুভূমি। পৃথিবীর ভয়ংকরতম উত্তপ্ত অঞ্চল।

কমান্ডো প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দুই সৈনিক-বন্ধু মরু-ট্রেকিংয়ে বের হয়েছে। বালুঝড়ে পড়ে সাথে নিয়ে আসা খাবার নষ্ট হয়ে গেছে। কম্পাসটাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একজন আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপাতে লাগলো।

এ নিয়ে কথা কাটাকাটি। এক পর্যায়ে ঝগড়াও বেঁধে গেলো। এক বন্ধু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে, নিজেকে সামলাতে না পেরে – বন্ধুকে চড় মেরে বসলো।

চড় খেয়ে অপর বন্ধু কিছু বললো না।

মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখে দিলো। শুধু বালুর উপর লিখে রাখলোঃ

"আমার প্রিয় বন্ধু আজ আমাকে চড় মেরেছে"।

দু'জন চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। পানি নেই, খাবার নেই। দুজনের অবস্থাই বেশ কাহিল। এক সময় তারা দু'জন একটা মরূদ্যানে পৌছলো। চড় খাওয়া বন্ধুটা হঠাৎ চোরাবালিতে আটকে গেলো। আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগলো। চড়মারা বন্ধু তাড়াতাড়ি মরূদ্যান থেকে মোটা দেখে কিছু লতাগুল্ম এনে বন্ধুকে টেনে বালুর ফাঁদ থেকে বের করে আনলো।

উদ্ধার পেয়ে চড়খাওয়া বন্ধু কোমরে ঝুলানো ছুরির ফলা দিয়ে একটা পাথরে লিখে রাখলোঃ

"আজ আমার প্রিয় বন্ধু আমার জীবন বাঁচিয়েছে"।

চড়মারা বন্ধু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, আমার চড় মারার কথা বালুতে লিখে রাখলে, আর জীবন বাঁচানোর কথা পাথরে লিখে রাখলে কেনো?

কেউ আঘাত করলে তা বালুতে লিখে রাখা উচিত, যেন ক্ষমার বাতাস তা সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আর কেউ উপকার করলে সেটা পাথরে খোদাই করে লিখে রাখা উচিত, যাতে কোনও কিছুই সেটাকে মুছে দিতে না পারে।

জীবন জাগার গল্প: ১০৮

আল্লাহর অস্তিত্ব

আমেরিকান ইউনিভার্সিটি। লেবানন। একজন অধ্যাপক ক্লাসে এসেই প্রশ্ন করলেন, তোমরা তো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। ছাত্ররা একবাক্যে উত্তর দিলো:

- জ্বি স্যার, আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী।

- আল্লাহই তো ভালোমন্দ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাই না?

- জ্বি স্যার, তিনিই ভালোমন্দ সবকিছুর স্রষ্টা।

- আল্লাহ যদি ভালো হয়ে থাকেন তাহলে মন্দকে সৃষ্টি করলেন কেন?

ছাত্ররা কোন উত্তর দিতে না পেরে নিশ্চুপ রইলো।

- তোমরা কি কখনো আল্লাহকে দেখেছো?

- জ্বি না, স্যার।

- বিজ্ঞানের সূত্র-মতে যে পদার্থ দেখা যায় না, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায় না তার কোনও অস্তিত্ব নেই।

তাহলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি:

যেহেতু আল্লাহকে দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না, আল্লাহরও কোনও অস্তিত্ব নেই।

মাঝের সারি থেকে একজন ছাত্র হাত তুলে কিছু বলার অনুমতি চাইলো। অধ্যাপক অনুমতি দিলেন।

- স্যার, আমি কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তব্যটা উপস্থাপন করতে চাইছি। স্যার, ঠাণ্ডা বলে কি জগতে কিছু আছে?

- আছে।

- দুঃখিত স্যার, উত্তরটা পুরোপুরি সঠিক বলা যাচ্ছে না।

আসলে স্যার, স্বতন্ত্রভাবে ঠাণ্ডা বলতে কিছু নেই। তাপমাত্রার

অনুপস্থিতিকেই ঠাণ্ডা বলা হয়ে থাকে। আমরা যে সাধারণত মেরু অঞ্চলে ঠাণ্ডাকে পরিমাপ করি তা আসলে তাপমাত্রার অনুপস্থিতির মাত্রাটাকেই প্রকাশ করি।

স্যার আরেকটা প্রশ্ন, অন্ধকার বলতে কি কিছু আছে?

- না, অন্ধকার বলতে আসলে কিছুই নেই।

- ঠিকই স্যার, অন্ধকার বলে কিছুই নেই।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা মন্দ সৃষ্টি করেননি। ভালোর অনুপস্থিতিকেই মন্দ বলে প্রকাশ করে থাকি আমরা।

আমরা আমাদের মস্তিস্ক দেখি না, কিন্তু যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা সম্ভব।

কিন্তু স্যার, মস্তিস্ক যে জ্ঞানকে ধারণ করে, তা কি দেখা যায়?

- না, জ্ঞান দেখা যায় না।

- তাহলে কি স্যার আমরা ধরে নেবো জ্ঞান নেই? কারণ জ্ঞান তো দেখা যায় না।

- না, তা হবে কেনো।

তাহলে স্যার এটা মানতেই হবে, কোনও নিয়মই নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত নয়। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে। দেখা না গেলেই তা নেই বলে প্রমাণ হয়ে যায় না।

জীবন জাগার গল্প: ১০৭

মদ্যপানের শাস্তি

কোনও এক আরব শহর। শহরে মদ্যপান নিষেধ। তারপরও গোপনে পান করার অপরাধে গোয়েন্দা পুলিশরা তিনজন মদ্যপায়ীকে আটক করলো। দ্রুত বিচার আইনে তাদের প্রত্যেককে আশিটা করে বেত্রাঘাত লাগানোর রায় দেয়া হলো।

দেখা গেলো, তিনজনের একজন আমেরিকান।

একজন ইসরাঈলি একজন ফিলিস্তিনি।

তিনজনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। জল্লাদ রায় কার্যকর করার আগে বললো:

শোনো! আজ আমার প্রথম সন্তান হয়েছে, আমি তোমাদের যে কোনও একটা 'আশা' পূরণ করবো।

আমেরিকান বললো, আমি চাই বেত্রাঘাতের আগে আমার পিঠে একটা বালিশ বেঁধে নিতে।

বালিশ বাঁধা হলো। দশ বাড়ি দেয়ার পরই দেখা গেলো বালিশ ফালাফালা হয়ে গেলো। এরপর তার পিঠ ফালাফালা হবার পালা।

এবার পালা এলো ইসরাঈলির। সে বললো, আমার 'আশা' হলো আমার পিঠে দুটো বালিশ বাঁধা হোক। তাই করা হলো।

পনেরো বাড়ি দেয়ার পরই বালিশ উড়ে গেলো। এরপর ইয়াহুদি বেটার পিঠ ওড়ার অপেক্ষা।

শেষজন ফিলিস্তিনি। জল্লাদ বললো:

তুমি একজন আরব, তোমার দেশবাড়ি নেই। ঘরবাড়ি ছাড়া। ভিটেমাটি ছাড়া। আমি তোমাকে দুইটা 'আশা' করার সুযোগ দেবো।

ফিলিস্তিনি বললো:

অনেক অনেক শুকরিয়া। ভাই! আমার প্রথম আশা হলো, আমাকে আশিটার জায়গায় একশটা বেত্রাঘাত করা হোক।

নিখাঁদ বিস্ময়ে জল্লাদের দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে হলো। বাকি দুইজনও কাৎরানি বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকালো।

আমার দ্বিতীয় আশা হলো:

বেত্রাঘাতের আগে, আমার পিঠে ইয়াহুদি ব্যাটাকে বেঁধে দেয়া হোক।

জীবন জাগার গল্প: ১১৩

হাসি-কান্না

এক জ্ঞানী লোকের মজলিস। অনেক জ্ঞানগর্ব আলোচনা চলছে। এক ফাঁকে মহাজ্ঞানী একটা মজার কথা বললেন। আসরের সবাই হো হো করে হেসে দিলো।

জ্ঞানীলোক মজার কথাটা আবার বললেন। এবার আসরের অর্ধেক লোক হাসলো।

জ্ঞানীলোক মজার কথাটা তৃতীয়বার বললেন। এবার আর কেউ হাসলো না।

তিনি হেসে বললেন, তোমরা এবার আর হাসতে পারলে না। অথচ হুবহু একই কথাই তো।

তাহলে বলো দেখি, একই ক্ষতস্থানের জন্য হাজারবার কেনো কাঁদো? চেষ্টা করো ব্যথাগুলোকেও এভাবে ভুলে যেতে!

জীবন জাগার গল্প: ১১১

জন্ম-মৃত্যু

এক নাবিককে প্রশ্ন করা হলো:

- আপনার পিতা কোথায় মারা গেছেন?
- আমার পিতা সমুদ্রে মারা গেছেন।
- আপনার দাদা কোথায় মারা গেছেন?
- সমুদ্রে।

প্রশ্নকর্তা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, এতকিছুর পরও আপনি সমুদ্রে যান?

এবার নাবিক পাল্টা প্রশ্ন করলেন:

- আপনার পিতা কোথায় মারা গেছেন?
- তিনি আমাদের ঘরের বিছানায় মারা গিয়েছেন।
- আর আপনার দাদা?
- তিনিও নিজ বিছানাতেই মারা গিয়েছেন।
- তারপরও আপনি ঘরের বিছানায় থাকেন, আশ্চর্য তো?

জীবন জাগার গল্প: ১১২

শিক্ষকের তোতা

একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। সারাদিন ছাত্রদেরকে পড়িয়ে-লিখিয়েই সময় কেটে যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন কারীম পড়তে শেখান। ইসলামের বুনিয়াদি বিভিন্ন বিষয় শেখান।

শিক্ষকের একটা তোতা ছিলো। তোতাটাও এসব শুনতে শুনতে শিখে গেলো। সেটা কতক্ষণ পরপরই বলে উঠতো (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। ওটার দেখাদেখি অন্য সবাইও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতো।

শিক্ষক একটা বিড়ালও পুষতেন। বিড়ালটার সাথে তোতার সম্পর্ক ছিলো সাপে নেউলে। সুযোগ পেলেই বিড়ালটা তোতাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতো।

এক রাতে, সুযোগ পেয়ে, বিড়াল তোতাটাকে মেরেই ফেললো। সকালে ছাত্ররা পড়তে এসে দেখলো:

তাদের শিক্ষক বসে বসে কাঁদছেন।

হুযুর! কী হয়েছে?

তোতাটা মারা গেছে।

একটা তোতার জন্য এভাবে কাঁদছেন?

আমি তোতার জন্য কাঁদছি কে বললো? আমি কাঁদছি, তোতার পরিণতি দেখে।

কেনো, তোতার কী হয়েছে?

তোমরা তো দেখেছো, তোতাটা সারাদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ করতো না। এমনকি গত কয়েক বছর যাবৎ সেটার মুখ থেকে তোতার ডাকও শুনতে পাইনি। আমি তো ভেবেছিলাম ওটা নিজ ডাক ভুলেই গেছে।

কিন্তু গত রাতে বিড়াল যখন ওটার উপর হামলা করলো, তখন দেখলাম তোতাটা কালিমা ভুলে ওটার নিজস্ব ডাক ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে।

এই ডাকটা সেটার মনের গহীনে খোদাই করা ছিলো।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সবকিছু ছাপিয়ে ওই আওয়াজটাই বের হয়ে এসেছে।

আমার মনে চিন্তা ঢুকলো, আমরাও তো তোতাটার মতো সারক্ষণই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছি-পড়ছি-লিখছি। কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি এই কালিমা ছাড়া, মনের গহীনে থাকা অন্য কোনও পাপকথা বের হয়ে পড়ে?

জীবন জাগার গল্প: ৯৯৮

মায়ের ভালোবাসা

ছিমছাম সাজানো-গোছানো সংসার। কোনও ঝুট-ঝামেলা নেই। হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। পরিবারের ছোট মেয়েটির ক্যান্সার ধরা পড়লো। দুরারোগ্য কালাত্মক ব্যাধি। নিস্তারের কোনও উপায় নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, মেয়েটা আর বেশিদিন বাঁচবে না। সবাইকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে বললেন।

মা-বাবা ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু বাইরে তার কোনও আলামত প্রকাশ হতে দিলেন না। বুকে পাথর বেঁধে মুখে হাসি ফুটিয়ে মেয়েকে যথাসাধ্য আদর-যত্নে রাখতে লাগলেন। মেয়েকেও বুঝতে দিলেন না।

মেয়ের মাথার চুলগুলো আস্তে আস্তে পড়ে যেতে শুরু করলো। চেহারা বদলে যেতে লাগলো। মায়ের মনটা হাহাকারে ভরে গেলো। মা বুদ্ধি করে ঘরের সমস্ত আয়না সরিয়ে ফেললেন। যাতে মেয়েটা নিজ চেহারা দেখে মন খারাপ করতে না পারে। এক সময় মেয়ের মাথার সমস্ত চুল পড়ে গেলো।

একদিন কিভাবে যেনো মেয়েটা রাস্তায় পড়ে থাকা ভাঙা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ফেললো। সে অবাক হয়ে হয়ে ভাবলো সবার মাথায় চুল আছে, আমার মাথায় চুল নেই কেনো?

রাতে আম্মু ঘুম পাড়ানি গল্প বলতে আসলেন। মেয়েটা জিজ্ঞাসা করলো: আম্মু সবার মাথায় চুল আছে, আমার মাথায় চুল নেই কেনো?

মা কোন উত্তর দিলেন না। চুপ থাকলেন। অন্য গল্প বলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, মাও নিজের মাথার সব চুল ফেলে দিলেন।

এত যত্নের চুলগুলো মুড়িয়ে ফেলতে খুব কষ্ট হলেও মেয়ের মনকে খুশি রাখতে এটুকু ত্যাগ তো কিছুই না।

জীবন জাগার গল্প: ১১৪

সফর

বিয়ে হয়েছে বিশ বছর হয়ে গেলো। হাসি-আনন্দে এতগুলো বছর কেটে গেলো। কোন্ ফাঁকে এতগুলো দিন অতিবাহিত হলো টেরই পাওয়া যায়নি। বিয়ের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রী ঠিক করলো কোথাও বেড়াতে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক হলো বিয়ের পর প্রথম দিনগুলো যেখানে কেটেছে সেখানেই যাবে। কোন এক হোটেলে থাকবে। স্বামী আগেই চলে গেলেন। ওখানে সব গোছগাছ করার জন্য।

সব ঠিকঠাক করে স্বামী মোবাইলে মেসেজ পাঠালেন। ঘটনাক্রমে নাম্বার ভুল হওয়ার কারণে মেসেজ চলে গেল আরেক মহিলার কাছে। এই মহিলার স্বামী মারা গেছেন দুদিন আগে।

মহিলা মেসেজটা পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। মহিলার ছেলে ঘরে ঢুকে দেখে মা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। হাতে মোবাইল ধরা। হাত থেকে

মোবাইলটা নিয়ে দেখে ওখানে একটা ম্যাসেজ ভেসে আছে। ম্যাসেজটাতে লেখা আছে:

প্রিয় স্ত্রী! আমি সহি-সালামতে পৌঁছেছি। তুমি বোধ হয় মোবাইলের মাধ্যমে তোমাকে ম্যাসেজ পাঠাতে দেখে অবাক হচ্ছো? অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানে যারাই আসে তাদেরকে একটা করে মোবাইল দেয়া হয়, বাড়ির সাথে যোগাযোগ করার জন্য। প্রতিদিন একবার করে। এখানে এসে আমি সবকিছু ঠিকঠাক করে রেখেছি। এখন আর তোমার আসতে আর কোনও বাধা রইলো না। শীঘ্রিই তোমাকে নিয়ে আসার জন্য লোক যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।

পুনশ্চ: আসার সময় শীতের কাপড় নিয়ে আসবে এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ছে।

ইতি
তোমাকে ছেড়ে আসা স্বামী

জীবন জাগার গল্প: ১১৮

মহা চক্রান্ত

এক মহিলার সাথে শয়তানের ঝগড়া লাগলো। শয়তান বললো, কুরআনে আছে,

নিশ্চই তোমাদের চক্রান্ত ভীষণ (ইউসুফ: ২৮)।

আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমার চেয়ে বড় চক্রান্তকারী আর কেউ নেই।

মহিলা: ঠিক আছে, চলো পরীক্ষা করে দেখা যাক। তুমি ওই দর্জিটার মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে, তার সংসারে ভাঙন ধরাতে পারবে?

শয়তান: অবশ্যই পারবো। এ তো ডালভাত।

শয়তান দর্জির দোকানে গেলো। নানাভাবে দর্জিকে ফুসলালো। কুমন্ত্রণা দিলো। দর্জি তার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতো। কিছুতেই তাকে বউয়ের ব্যাপারে কোনো কথা বিশ্বাস করানো গেলো না। শয়তান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।

মহিলা: এবার আমার পালা। দেখো কী ঘটে।

মহিলা দর্জির কাছে গেলো।

আমাকে একটা সুন্দর কাপড় দেখান তো। আমার ছেলে এক বিবাহিতা মহিলাকে উপহার দিবে। তারা বোধ হয় একে অপরকে বিয়েও করবে।

দর্জি সুন্দর একটা কাপড় দিলো। মহিলা সেটা নিয়ে চলে এলো। এরপর দর্জির বাড়িতে গেলো। দর্জির স্ত্রীকে বললো,

আমি কি আপনার বাড়িতে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি? আমি বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে আবার নামাযের সময় পার হয়ে যাবে।

-কেনো পারবেন না। আসুন, ভেতরে আসুন।

মহিলাটি ভিতরে গিয়ে নামায পড়ার এক ফাঁকে কাপড়ের টুকরোটা ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রাখলো।

রাতে দর্জি এসে কাপড়টা দেখেই রেগে কাঁই। কোনরকম বিচার-বিবেচনা না করেই বউকে তালাক দিয়ে দিলো।

মহিলাটি শয়তানকে বললোঃ

-কী, এবার বিশ্বাস হলো তো?

-হ্যাঁ তাইতো দেখছি।

মহিলাঃ তুমি কি এখন তাদের দুজনের মাঝে মিল ঘটিয়ে দিতে পারবে?

শয়তানঃ তুমি যে চক্রান্ত করেছো, এরপর মিল হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

মহিলাঃ তুমি অপেক্ষা করে দেখে যাও কী ঘটে!

পরদিন মহিলা দর্জির দোকানে গিয়ে বললো, গতকাল আমি যে কাপড়টা নিয়েছিলাম হুবহু ওটার মতো আরেকটা কাপড় দিন তো! গতকাল আমি এক বাড়িতে নামাজ পড়তে গিয়ে ওটা ভুলে ফেলে এসেছি। এখন কাপড়টার জন্য ও বাড়িতে যেতে লজ্জা লাগছে।

একথা শুনতেই দর্জি বাড়ির দিকে ছুটলো।

মহিলার কাণ্ড দেখে শয়তান মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলো।

(নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপঃ হুজুরাত ১২)।

জীবন জাগার গল্প: ৯৯৮

হিজাবের জিহাদ

মার্সেই। ফ্রান্সের সুন্দর এক শহর। শহরের প্রাণকেন্দ্রের এক মাধ্যমিক স্কুল। প্রধান শিক্ষক ফ্রাঁসোয়া মিলিন্দের কক্ষ।

একজন ছাত্রী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। স্যার, আমি কি আসতে পারি।

জ্বি, আযীযা এসো। তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। তোমাকে ডেকেছি আমাদের স্কুল কমিটির একটা সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য।

কী সিদ্ধান্ত স্যার?

তুমি তো জানোই, ফ্রান্সের স্কুল-কলেজে, প্রকাশ্যে খোলা স্থানে হিজাব পরা আইনতঃ নিষিদ্ধ।

জ্বি, স্যার।

কিন্তু তারপরও তুমি হিজাব পড়ে স্কুলে আসছো। তোমাকে কয়েকবার সতর্কও করা হয়েছে। এমনকি জরিমানাও করা হয়েছে।

স্যার আমি তো জরিমানা আদায় করে দিয়েছি।

আযীযা! বোকার মতো কথা বলছো কেনো? জরিমানা করা হয়েছে তুমি হিজাব পড়ে স্কুল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছো এবং রীতিমতো ক্লাশ করেছো সেজন্য। আর ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না এ মর্মে সতর্ক করার জন্য।

অথচ তুমি ভেবে বসে আছো, জরিমানা নিয়ে তোমাকে হিজাব পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটাতো এমন নয়।

স্যার, তাহলে আমি এখন কী করবো?

তুমি চুল ঢাকার জন্য মাথায় হিজাব পরে স্কুলে আসতে পারবে না।

কিন্তু স্যার, আমাদের ধর্মে তো মেয়েদেরকে মাথার চুল ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে?

তোমাদের ধর্মে কী আছে সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তো আমার দেশের আইন মানতে বাধ্য। ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আগামীকাল থেকে মাথার হিজাব খুলে, চুল উন্মুক্ত রেখে স্কুলে আসবে।

পরদিন স্কুলের প্রধান ফটকে ভীড় লেগে গেলো। মশিয়ে ফ্রাঁসোয়াও ঘটনা কী দেখার জন্য এলেন। তিনি দেখলেন:

আযীযাকে তার বান্ধবীরা ঘিরে ধরেছে। কয়েকজন সাংবাদিক তার সাথে কথা বলছে।

গতকালও তো তোমার মাথায় চুল ছিলো, আজ নেই কেনো? এই পনেরো বছর বয়সে কেউ মাথা মুণ্ডায়?

আমার ধর্ম মেয়েদেরকে মাথার চুল ঢেকে রাখতে হুকুম দিয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে চুল খোলা রাখতে বাধ্য করেছে। তাই আমি আমার ধর্ম ও স্কুল উভয়টাকে ঠিক রাখতে এই পন্থা গ্রহণ করেছি।

আর এটাই আমার নীরব প্রতিবাদ।

জীবন জাগার গল্প: ৯১৭

স্বচ্ছ আকাশ

বিকেল। গোধূলি লগ্ন। সুয্যি ডুবি ডুবি করছে। ছেলে বাবার হাত ধরে বাসা থেকে বের হলো। বেড়াতে। বাসার সামনেই পুঁতি-দুর্গন্ধময় ড্রেন। দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসার যোগাড়।

আব্বু! আমাদের চারপাশটা এতো নোংরা কেনো?

– কারণ এখানে মানুষ বাস করে।

হাঁটতে হাঁটতে বাপ-বেটা পার্কে গেলো। পার্কের খোলা মাঠে পাড়ার ছেলেরা খেলছে। উপরের আকাশটা ছিলো খোলা আর স্বচ্ছ। নীল আর শাদায় মাখামাখি। ছেলে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

আব্বু! আকাশটা এত স্বচ্ছ আর সুন্দর কেনো?

কারণ, সেখানে মানুষ বাস করে না।

জীবন জাগার গল্প: ৯১৮

সোনার মোহর

শহরতলির পথ। মোটামুটি ব্যস্তই বলা চলে। বিকেলের দিকে রাস্তাটা ফাঁকা থাকে। ছেলেপিলের দল রাস্তা খালি পেলেই খেলা শুরু করে দেয়।

একদিন দুপুর বেলা, জীর্ণশীর্ণ পোশাকের এক ভগ্নস্বাস্থ্যের পৌঢ়, সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। নতুন অপরিচিত আগন্তুক দেখে সবার চোখ পড়লো। হঠাৎ লোকটা একটা গর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। আশেপাশের

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। বলাবলি করতে লাগলো, লোকটা আস্ত হাঁদারাম। এমন খটখটে শুকনো জায়গায় কেউ পড়ে?

পড়ে যাওয়া লোকটা হাস্যরত সবার দিকে একবার চোখ বুলালো। তারপর গর্তের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে সেও হেসে দিলো। এরপর উঠে নিজ পথে রওয়ানা হলো।

পরদিন লোকটাকে আবার রাস্তায় দেখা গেলো। অবাক কাণ্ড, আজও ঠিক একই জায়গায় লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। আশেপাশের সবাই যেন হাসির জন্য মুখিয়েই ছিলো। ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। লোকটাও গর্তের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে উঠে চলে গেলো।

এভাবে পরপর কয়েকদিন হলো। মহল্লার মানুষের মাঝে সাড়া পড়ে গেলো। সবাই বিকেল হলেই জটলা পাকিয়ে তামাশা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিন দেখা গেলো সন্ধ্যা নেমে এলো, কিন্তু লোকটা এলো না। পরদিনও না। এভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো। সবাই লোকটার কথা ভুলে যেতে বসেছে। এমন সময় একদিন বিকেলে আবার লোকটাকে রাস্তায় দেখা গেলো।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো, লোকটা পায়ে হেঁটে আসছে না। বিশাল এক রাজকীয় এ্যারাবিয়ান ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে। দুই পাশে সৈনিকের উর্দি পড়া দুইজন অস্ত্রধারী পাহারাদার।

লোকেরা তাজ্জব বনে গেলো। একজন সাহস করে এগিয়ে এলো। আপনার এমন উন্নতি হলো কীভাবে?

আমি এই এলাকার ইতিহাস একটা বইয়ে পড়েছি। সেখানে লেখা আছে, এই রাস্তাটা এখন যেখানে আছে, সেখানে অনেক আগে একটা রাজপ্রাসাদ ছিলো। সেই রাজপ্রাসাদ ভূমিকম্পে তলিয়ে গিয়েছিলো। সেই সাথে রাজার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারও তলিয়ে গিয়েছিলো। আমি সেই ইতিহাস পড়েই এই এলাকায় এসেছিলাম। ভাগ্যক্রমে সেদিন আছাড় খেয়ে যে গর্তে পড়েছিলাম সেটা ছিলো আসলে রাজপ্রাসাদের একটা সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটা বেশি গভীর ছিলো না। আমি হাত দিয়ে দেখলাম ভেতরে কিছু একটা ঝনঝন করছে। টেনে বের করে দেখি সোনার মোহর। মোহরটা দেখে আমিও সবার সাথে হেসে উঠেছিলাম।

এভাবে প্রতিদিন অল্প অল্প করে মোহরগুলো তুলে নিয়েছি।

জীবন জাগার গল্প: ১১৭

সাঁতরে নদী পার

বইয়ে লেখা আছে, ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়াটা একজন সাঁতারুর পরম কাঙ্খিত বিষয়। অনেক সম্মানের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের মাসুদুর রাহমানের উভয় পা-ই নেই। তবুও দমে না গিয়ে দুটো পা ছাড়াই সে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসেছে।

শিবলীরও ইচ্ছে, একদিন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবে। বড় আপুর সাথে বাড়ির পুকুরে সাঁতার কাটা শিখেছে সেই কত আগে।

বাড়ির পাশে চেঙী নদী। তার অনেকদিনের ইচ্ছা, এই নদীটা সাঁতরে পার হবে।

একদিন প্রস্তুতি নিয়ে বের হলো। পথে দেখা হলো বাল্যবন্ধু বিলালের সাথে।

- কিরে, এই সাত সকালে কোথায় যাচ্ছিস?

- ভাবছি নদীটা সাঁতরে পার হবো।

- বলিস কি? এই নদী তো কুমিরে ভর্তি। নানা সাপখোপ কিলবিল করছে।

- তাই নাকি?

- তো আর কি বলছি!

- তাহলে থাক, সাঁতরে নদী পার হয়ে আর কাজ নেই।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। ভয়ে আর নদীমুখো হওয়ার ইচ্ছা জাগে নি।একদিন পত্রিকায় সাঁতারের কথা পড়ে আবার আগের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

পরদিন সকালে আবার প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে গেলো। পথিমধ্যে দেখা হলো গ্রামের মাতব্বরের সাথে।

কী খোকা! এই কাকডাকা ভোরে কোথায় চললে?

চাচাজি! আমি ঠিক করেছি সাঁতরে নদীটা পার হবো।

এখন কিভাবে তুমি নদী পার হবে। বর্ষা এসে গেছে। নদী কানায়-কানায় ভর্তি। দুকূল ছাপিয়ে পানি কলকল-ছলছল করছে।

আচ্ছা, তাহলে থাক। জোয়ার নেমে গেলে সাঁতার কাটবো।

জোয়ার এলে নদীতে অনেক মাছ নামে। তীর ঘেঁষে জাল ফেললে প্রতি ক্ষেপেই অনেক টেংরা, পুঁটি ইত্যাদি ধরা পড়ে।

নদীতে মাছ ধরতে এলো। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো একটা ছেলে পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করছে। শিবলী আগপিছ না ভেবেই নদীতে ঝাঁপ দিলো। ডুবন্ত ছেলেটাকে তীরে এনে তুললো।

- তুমি নদীতে পড়লে কিভাবে?

- আমাদের খেলার বলটা পানিতে পড়ে গিয়েছিলো। ওটা তুলে আনার জন্য নামতেই স্রোতের টানে ভেসে গেছি।

- নদীতে অনেক সাপ-কুমিরের আড্ডা, তাছাড়া স্রোতও বেশি। আর কখনো নামবে না।

ছেলেটা বললো, কই আমি তো কোনও সাপ-কুমির দেখি নি? আর আমি তো ডুবে যাচ্ছিলাম স্রোতের কারণে নয়, সাঁতার না জানার কারণে।

শিবলী ভাবতে লাগলো, নদীতে নামার পর, কোনও সাপ তো তাকে কামড়াতে আসে নি। কুমিরও না। আর স্রোতের মধ্যে সে শুধু একা নয়, আরেক জনকে নিয়ে সাঁতার কেটেছে। কই, সে তো ভালভাবেই তীরে আসতে পেরেছে।

সে তার ভুল বুঝতে পারলো। সে এতদিন শুধু শুধুই ভয় পেয়েছে। তখনই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনায়াসেই সাঁতরে ওপারে গিয়ে আবার ফিরে আসলো।

জীবন জাগার গল্প: ১২৩

মৌমাছির শিল্পকৌশল

ছোট্ট পাখি টুনটুনি। বাগানে এ গাছ ও গাছে নেচে বেড়াচ্ছে। বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে।

একটা মৌমাছি উড়ে এলো। একটা সুন্দর ফুলের উপর বসে মধু আহরণ করতে লাগলো। টুনটুনি বললো:

মৌমাছি ভায়া! তুমি সারাক্ষণ পরিশ্রমে লেগে থাকো। মধু আহরণে লেগে থাকো। তোমার কষ্ট লাগে না?

না, কেনো কষ্ট লাগবে? পরিশ্রম করতে আমার ভালো লাগে।

তুমি মধু আহরণে কতইনা কষ্ট করো। কিন্তু মানুষ তোমাকে না জানিয়েই মধু নিয়ে যায়। তোমার দুঃখ হয় না?

না, আমার কোনও দুঃখ হয় না।

কেনো?

তারা আমার সৃষ্টিকে চুরি করে। আমার সৃষ্টিকৌশলকে তো আর চুরি করতে পারে না। তারা আমার শিল্পকে নিয়ে যায়। আমার শৈল্পিকতাকে নিয়ে যেতে পারে না।

জীবন জাগার গল্প: ৯২৯

রিযিক-রহস্য

রমিয মিয়া একজন দিন মজুর। দিন আনি দিন খাই অবস্থা। বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন। স্ত্রী ও তিন সন্তানসহ বেশ বড় সংসার।

রমিজ মিয়া এখন মেম্বারের বাড়িতে ঠিকা কাজ করছে।

সে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে। এক মুহূর্তও বসে অলস সময় কাটায় না।

একদিন রমিজ মিয়া কাজে আসলো না। মনিব ভেবেচিন্তে ঠিক করলো,

আগামীকাল থেকে মজুরি আরো বাড়িয়ে দেবো। তাহলে সে আর অনুপস্থিত থাকবে না। টাকার টানে হলেও প্রতিদিন হাজির থাকবে। আমার যে তাকে ছাড়া একদিনও চলে না সে তো সেটা ভালোভাবেই জানে।

পরদিন রমিজ মিয়া কাজে আসলো। দিনশেষে মনিব তাকে মজুরি দেয়ার পর, অতিরিক্ত আরো টাকা দিলেন।

রমিজ মিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করলো। কিছু বললো না। কোনও প্রশ্ন করলো না।

কয়দিন পর রমিজ মিয়া আবার অনুপস্থিত। মেম্বার সাহেব রেগে গেলেন। পরদিন মজুরি দেয়ার সময় অতিরিক্ত মজুরি কমিয়ে দিলেন।

রমিজ মিয়া আজকেও কোনও কথা না বলে মজুরি গ্রহণ করলো। কম দেয়ার কারণ জানতে চাইলো না।

মেম্বার সাহেব অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন:

তোমাকে এর আগে মজুরির অতিরিক্ত টাকা দিলাম, তুমি কোন প্রশ্ন না করেই টাকাটা নিয়ে নিলে। এরপর আজ কমিয়ে দিলাম, সেটাও কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নিয়ে নিলে, ব্যাপারটা কী?

মেম্বার সাব! টাকা কম আর বেশি হওয়ার কারণ তো আমি জানি। সেজন্য জিজ্ঞাসা করিনি।

কিভাবে জানলে?

আমি প্রথমবার যেদিন অনুপস্থিত ছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটা পুত্রসন্তান দান করেছিলেন। পরদিন আপনি আমাকে মজুরি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি মনে মনে বলেছি, এটা আমাদের সন্তানের রিযিক। এই রিযিক সে সাথে করেই নিয়ে এসেছে।

গতকাল আমার আম্মা মারা গিয়েছেন। আজ মজুরি কম পেয়ে ভেবেছি, আম্মা চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর রিযিকও চলে গেছে।

জীবন জাগার গল্প: ১২২

ব্ল্যাক ম্যাজিক

ইক্বরা টিভি। সরাসরি ফোনালাপ অনুষ্ঠান চলছে। উপস্থাপনায় আছেন শায়খ আবদুল্লাহ শাহাদাত। এক মহিলা কল করলো।

-আসসালামু আলাইকুম।

-ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম।

-শায়খ! আমি অনেক বড় গুনাহ করে ফেলেছি। আল্লাহ তা'আলা কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

-কেনো ক্ষমা করবেন না, অবশ্যই ক্ষমা করবেন। নিশ্চই তিনি অতি ক্ষমাশীল অতি দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মা'ফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু (যুমার: ৫৩)।

-কিন্তু আমার গুনাহটা অনেক বড় আর গুরুতর। আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করবেন না।

-না, বোন! আপনি এমনটা ভাববেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(নিশ্চই আল্লাহ তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া আর (সব) পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে সে ঘোরতর ভ্রান্তিতে পতিত হয় (নিসা:১১৬)।

-আমি সাত-সাতবার হজ করেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত একবারও কা'বাঘর নিজ চোখে দেখতে পাইনি।

শায়খ: ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাব।

মহিলা: আমি হেরেমে প্রবেশ করার পর তাওয়াফকারীদেরকে দেখি, কিন্তু কা'বাঘর দেখতে পাই না। এমনকি একজন আমার হাত ধরে কা'বা শরীফ ছুঁইয়েও দেখিয়েছে। আমি হাত দিয়ে কা'বা ধরতে পেরেছি। কিন্তু কা'বা আমার সামনে দৃশ্যমান হয়নি।

শায়খ: তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আপনার পাপটা সত্যিই গুরুতর। বলুন তো কী এমন পাপ করেছেন? নিশ্চিত হয়ে বলুন, যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হয়।

মহিলা: আমি অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিলাম। বিয়ের পরও অনেকবার হয়েছে। আমি ঠিক বলতে পারছি না, কোন পাপের কারণে আমার এই অবস্থা হয়েছে।

শায়খ: অসম্ভব! এটা ছাড়াও অন্য কোনো পাপ আছে। শুধু অশ্লীলতার জন্য এমনটা ঘটতে পারে না। আপনি ভেঙে বলুন। আপনি কী করেছেন?

মহিলা: সত্যি কথা বলতে কি, আমি একজন নার্স। আমার গোপনে সম্পর্ক ছিলো একদল ব্ল্যাকম্যাজিক (কালোজাদু) চর্চাকারীদের সাথে। তারা নানাভাবে জাদুচর্চা করতো। তারা শবসাধনা করতো।

জাদুকরদের শিখিয়ে দেয়া নিয়মানুযায়ী, হাসপাতালের হিমাগারে চুরি করে প্রবেশ করতাম। শবগুলোর মুখে 'বিশেষ কাজ' করে মুখগুলো সেলাই করে দিতাম। শবগুলোকে এ অবস্থাতেই দাফন করা হতো। এ ন্যাক্কারজনক কাজ অসংখ্যবার করেছি।

শায়খ: এমন কাজ কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। জাদুবিদ্যা তো শিরক।

নিশ্চই শিরক বড় পাপ (লুকমান: ১৩)।

দুই সপ্তাহ পরে, 'ইকরা' অনুষ্ঠানে একটা ফোন আসলো।

-আসসালামু আলাইকুম।

-ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম।

-হ্যালো শায়খ! দু সপ্তাহ আগে একজন মহিলা ফোন করেছিলেন, আমি তার সন্তান।

শায়খ: জ্বি, বাবা! চিনতে পেরেছি। বলো কী খবর।

ছেলে: শায়খ! আমার আম্মু ইন্তিকাল করেছেন। তার মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। কিন্তু দাফনের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, আমরা কেউ ধারণাও করতে পারি নি এমনটা কখনো ঘটতে পারে।

শায়খ: কী ঘটনা?

ছেলে: জানাযার পর আমরা কবরস্থানে গেলাম। লাশ কবরে নামাতে গিয়েই বিপত্তি বাঁধলো। আমরা কবরে নামলেই কবরটা সংকুচিত হয়ে আসে। লাশ বের করলে কবরটা আবার ঠিক হয়ে যায়। আবার লাশ নামালে কবরটা সংকুচিত হয়ে যায়।

এমনকি আমাদের পক্ষে ভেতরে দাঁড়ানোও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ ঘটনা দেখে, সাথে যারা ছিলো ভয়ে পালিয়ে গেলো। তারা বললো, তোমার মা হয়তো এমন কোনও কাজ করেছে যে, কবর তাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। এমন সময় দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক আসলেন। তার পোশাক ছিলো অত্যন্ত উজ্জল আর শুভ্র। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায় এমন একজন মানুষ। তাকে দেখেই আমার মনে হলো, আমার সামনে একজন ফিরিশতা দাঁড়িয়ে আছেন। বিশেষ করে তার কথা শুনে বিশ্বাসটা আরো বদ্ধমূল হলো। তিনি বললেন,

তোমার আম্মুকে যেভাবে আছে রেখে চলে যাও। পেছনে ফিরে তাকাবে না। আমি কোনও কথা না বলে চলে আসলাম। কিছুদূর আসার পর আমি

আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। আমার মায়ের কী হলো সেটা না দেখে বাড়ি যেতে মন টানছিলো না। পেছন ফিরে তাকালাম।

দেখলাম, আকাশ থেকে প্রকাণ্ড এক অগ্নিগোলক ছুটে আসলো। চোখের নিমিষেই আম্মার লাশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। খাটিয়াসহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

আগুনের উত্তাপ এত প্রবল ছিলো যে, এতদূর থেকেও আমার মুখটা ঝলসে গেলো। শুধু দুচোখ অক্ষত রইলো।

আমি চিন্তিত হয়ে গেলাম, আমার চেহারা কেনো ঝলসে গেলো? আল্লাহ কি আমার প্রতি নারাজ?

শায়খ: প্রিয় বৎস! সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা মায়ের পাপ থেকে তোমাকে পবিত্র করতে চেয়েছেন। তুমি তো তোমার মায়ের হারাম উপার্জনেই বড় হয়েছো। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যা দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

জীবন জাগার গল্প: ৯২৩

হৃদয়ের বসন্ত

কায়রো। মিসরের রাজধানী। জামি'আ আযহারের অধিভুক্ত একটি কিন্ডার গার্টেন। শিশুদের ছবি আঁকার ক্লাস। আপুমণি এসেই সবাইকে বললেন:

সোনামণিরা, আজ আমরা বসন্ত আঁকবো। সবাই ঝটপট বসন্তের একটা ছবি এঁকে ফেলো দেখি!

সবাই বসন্ত আঁকায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কেউ কোকিল আঁকলো। কেউ ফুল বাগান আঁকলো। কেউ ফসলের জমি আঁকলো।

সবাই খাতা জমা দিলো। আপুমণি একটা একটা করে খাতা দেখছেন। আর প্রশংসা করে উৎসাহ দিচ্ছেন।

একটা খাতা দেখতে গিয়ে থমকে গেলেন, দেখলেন বসন্তের কোনও ছবি নেই। আছে একটা কুরআন কারীমের ছবি। নাম ধরে ডাকলেন?

এক মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তুমি এটা কী ধরনের বসন্ত এঁকেছো?

আপুমনি! আমি কুরআনের ছবি এঁকেছি।

বসন্তের ছবি কোথায়?

আম্মু প্রতিদিন দু'আ করেন, হে আল্লাহ! কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দিন।

তাই আমি ভেবেছি, আম্মুর মতো আমারও বসন্ত হলোঃ কুরআন।

স মা প্ত

আলহামদুলিল্লাহ